মাসুদ রানা
ধ্বংসের নকশা
কাজী আনোয়ার হোসেন

ধ্বংসের নকশা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

হিথ্রো এয়ারপোর্ট, লন্ডন। ধীর, আত্মবিশ্বাসী পায়ে ওয়াশরুমে এসে ঢুকল এক লোক। হাতে একটা ছোট বাদামী সুটকেস। পাঁচ ফুট আট হবে সে, পেশীবহুল দেহ। পা ফেলে বেড়ালের মত নিঃশব্দে। হালকা নীল, অন্তর্ভেদী চোখ। সরু ভুরুজোড়া নাকের ওপরে প্রায় মিশে আছে পরস্পরের সাথে। খাড়া নাক। সোনালী চুল।

জিনস্ আর টি-শার্ট পরে আছে লোকটা, পায়ে সাদা মোজার সাথে নাইকি কেডস্। এয়ের লিঙ্গাসের একটু আগে ল্যান্ড করা ১৫৪ নম্বর ফ্লাইটের যাত্রী-এসেছে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন থেকে।

ভেতরে এসে একসার কিউবিকলের শেষ মাথার দিকে এগোল সে। ডাঙ্গারী পরা এক ক্লীনারকে পাশ কাটাল। ওয়াশরুমের টাইলড মেঝে পরিষ্কার করছে সে বড় এক স্কুইজী দিয়ে। আর কাউকে চোখে পড়ল না আগন্তুকের।

সোজা হেঁটে গিয়ে এক কিউবিকলে ঢুকল, ভেতর থেকে বোল্ট লাগিয়ে দিল। ল্যাভেটরি সীটের ওপর সুটকেসটা রেখে খুলল, একটা আয়না বের করল ভেতর থেকে, দরজায় কোট ঝোলানো হুকের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে ওতে নিজেকে দেখল। মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল আপনমনে।

তারপর দু'হাতের তর্জনী ও মধ্যমা সোজা রেখে সামান্য চাপ দিয়ে ভরে দিল চুলের রেখার নিচ দিয়ে, কপালের দু'পাশ থেকে। ঢুকে গেল আঙুল। আরেকটু চাপ পড়তে উঠে এল তার উইগ, বেরিয়ে পড়ল ক্রু-কাট দেয়া বাদামী রঙের আসল চুল। ওটা রেখে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ ভুরুর বাইরের প্রান্ত ধরে আস্তে করে টান দিল। মৃদু চড়-চড় শব্দ করে উঠে এল নকল ভুরু। বেরিয়ে পড়ল তার বাদামী আসল ভুরু। চওড়া, আ-ছাঁটা।

এরপর সাদা আন্ডারশর্ট ছাড়া পরনের আর সব খুলে ফেলল সে। পেশাদারী দক্ষতার সাথে কাজ করছে এক মনে। এবং দ্রুত হাতে, ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল্লা দিয়ে।

সুটকেস থেকে একটা ক্যানভাস করসেট বের করল লোকটা, কোমরে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল। দুটো কাজ হলো এতে–কোমর বেশ খানিকটা সরু হলো, এবং মনে হলো যেন উচ্চতাও সামান্য বাড়ল। পরেরটা অবশ্য একটু পরই প্রতিষ্ঠিত হলো। জিনস, টি-শার্ট ও মোজা সুটকেসে ভরে নতুন একজোড়া গাঢ় ধূসর মোজা পরল সে। চমৎকার ছাঁটের গ্রে লাইটওয়েট ট্রাউজার পরে পা গলিয়ে দিল কেডসের চাইতে দু'ইঞ্চি উঁচু সলিড হীলের একজোড়া কালো পিপ-অন শুর মধ্যে।

এরপর সাদা সিল্কের শার্ট পরল, গলায় বাঁধল পার্ল গ্রে টাই। নট ঠিকঠাক করে সুটকেস থেকে প্লাস্টিকের আয়তাকার একটা বক্স বের করল সে, তার ভেতর থেকে বের হলো একজোড়া জেট ব্ল্যাক কন্ট্যাক্ট লেন্স আর ফ্লুইড। মণির রঙ বদলে নকল দাড়ি-গোঁপ যত্নের সাথে জায়গামত জুড়ল সে। নকল হলেও আসল দাড়ি-গোঁপ দিয়েই তৈরি ওগুলো–ফ্লেক্সিবল্, অ্যাডহেসিভ লেটেক্স ফ্রেমের সাথে এমনই নিখুঁতভাবে জোড়া যে একেবারে কাছে থেকে দেখলেও বোঝার উপায় নেই আসল না নকল।

এবার দুই গালের মধ্যে ছোট দুই ফোম রাবার প্যাড গুঁজে দিল লোকটা। দেখতে আগের থেকে সামান্য ফোলা ফোলা হলো মুখ। ও দুটো না খোলা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করা বা খাওয়া, কোনটাই করতে পারবে না সে, তবে তাতে কিছু আসবে-যাবেও না। দু'চার ঘণ্টা না খেলে মানুষ মরে না। ট্রাউজারের ম্যাচিঙ জ্যাকেট বের করে পরল এবার লোকটা, আয়নার অচেনা প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল।

বাকি কাজগুলো খুব দ্রুত সারল। এতক্ষণ সাথে যা যা ছিল, সব পাল্টে নগদ টাকা বোঝাই নতুন ওয়ালেট, পাসপোর্ট, ট্রাভেল ডকুমেন্টস, ট্রাভেলার্স চেক, রুমাল, খুচরো পয়সা এ-পকেটে ও-পকেটে ভরল। বাঁ হাতে পরল একটা গোল্ড ডিজিটাল ঘড়ি। এরপর একটা টাইট ফিটিং কভার বের করল সুটকেসের চেহারা পাল্টে ফেলার জন্যে। বালিশের গিলাফের মত জিনিসটা, পরাতেই বাদামী সুটকেস চকচকে কালো চেহারা পেল।

তারপর সর্বশেষ আইটেম–কেবল ডানহাতের জন্যে একটা স্কিন কালার প্লাস্টিক গ্লাভস, বের করে পরে নিল। জিনিসপত্র সব সুটকেসে ভরে বন্ধ করল ওটা। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিল কোথাও কিছু পড়ে থাকল কি না। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে–নেই।

সুটকেস বাঁ হাতে নিল লোকটা, ডান হাত ভরে দিল সিসটার্নের পিছনদিকে। আছে ওটা জায়গামতই। থাকবে যে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না, তাই এতক্ষণ চেক করে দেখার কথা একবারও ভাবেনি সে। অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে আটকে রাখা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বের করে কোটের সাইড পকেটে রাখল, ওটা একটা কোল্ট পাইথন–ছোট, সহজে বহনযোগ্য।

বেরিয়ে এল সে কিউবিকল্ থেকে। ক্লীনারের দিকে তাকাল–এই সময়ের মধ্যে অনেকেই এসেছে–বেরিয়ে গেছে, টের পেয়েছে সে, কিন্তু ওই লোক এখনও একই জায়গায়। ব্যাপারটা সে খেয়াল করল কি না বোঝা গেল না, পাশ কাটিয়ে আগের মতই দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে বেরিয়ে গেল।

অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল 'ক্লীনার', স্কুইজী ফেলে বেরিয়ে এল ওয়াশরুম থেকে। লোকটাকে গজবিশেক সামনের এক বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ছুটল। বাঁক ঘুরতে ডানেই একটা কাঁচঘেরা ফোন বুদ, ওর মধ্যে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে নাম্বার পাঞ্চ করতে শুরু করল–তার টার্গেট তখন আরেক বাঁক ঘুরে চলে যাচ্ছে ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে।

ও প্রান্তে সাড়া পেয়ে কথা বলতে শুরু করল 'ক্লীনার', নজর নিচের দিকে।

কয়েকটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছে সে, এমনসময় বুদের দরজা খুলে গেল, ঘুরে তাকাল 'ক্লীনার', পরক্ষণে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল চোখের সামনেই সাইলেন্সার পরানো একটা কোল্ট পাইথন দেখতে পেয়ে। সেই লোক! ফিরে এসেছে! হাসছে মিটিমিটি।

তার হাসি মুখ দেখতে দেখতে মারা গেল 'ক্লীনার'।

এর কয়েক মিনিট পর ট্যাক্সি নিয়ে কিংস ক্রস রেল স্টেশনের দিকে ছুটল লোকটা। অনেকটা পথ যেতে হবে।

দুই

বিসিআই, ঢাকা।

নিজের শানদার অফিসে বসে আছে মাসুদ রানা। চেহারা দেখে মনে হবে পেট কামড়াচ্ছে বুঝি। ত্যাড়া হয়ে আছে। মেজাজ খাট্টা। প্রায় দু'মাস হতে চলল হাতে কাজ নেই, বসে থেকে থেকে অভিযানপ্রিয় মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে ওর। বন্ধ হয়ে আসছে দম অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে আটকা থেকে। পালাই পালাই করছে।

সে পথও নেই। কাজ নেই বলে ছুটিতে যেতে চেয়েছিল, দেয়নি বুড়ো, প্রয়োজন হতে পারে বলে বসিয়ে রেখেছে। তাও কোনরকমে মানিয়ে নেয়া যেত যদি সহকর্মীরা কেউ থাকত, আর কিছু না হোক, আড্ডা তো মারা যেত। তারও উপায় নেই। ওরা সবাই দেশ-বিদেশে কাজে ব্যস্ত, একমাত্র ও বসে আছে অকাজে। কিচ্ছু করার নেই।

ছুটির দিনে বাসায় বসে বাগানের পরিচর্যা করা, এবং অফিসের দিনগুলোয় অফিসে বসে বসে খবরের কাগজ পড়া, এই করে কাটছে দিন। কিন্তু তাই বা কাঁহাতক! সব কিছুরই একটা সীমা থাকে। কাজ নেই, ছুটি দিতে অসুবিধে কি? এটাও নেই, ওটাও হবে না, এ কেমন কথা?

আজ আরেকবার ছুটির কথা বলে দেখতে হবে রাহাত খানকে, ভাবছে রানা, যা থাকে কপালে। এভাবে আর বসে থাকতে পারছে না ও। হাতের পত্রিকাটা বিরক্তির সাথে টেবিলের এক কোণে ছুঁড়ে মারল। এই হয়েছে আরেক যন্ত্রণা, প্রায় সবগুলো পত্রিকা আজকাল এমন নির্লজ্জের মত ক্ষমতাসীনদের সাথে গলা মেলাচ্ছে যে খবর পড়লে মনে হয় না ওসব খবর, মনে হয় সরকারী প্রেসনোট। প্রতিটি লাইনে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে পত্রিকাওয়ালারা, তাদের ধারণা, যা লেখা হয় তাই বিশ্বাস করে মানুষ। দেশ যে রসাতলে যাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না। সত্যি, সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ!

সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল ইন্টারকমে রাহাত খানের ভরাট গলা শুনে। 'রানা! ব্যস্ত?'

খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রশ্নটা শুনে মন দমে গেল। 'না, স্যার! হাতে কোন

কাজই নেই।'

'এসো তাহলে, কথা আছে।'

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পড়ে গেল ও, নীরব হয়ে যাওয়া ইন্টারকমের দিকে তাকিয়ে থাকল। অফিশিয়াল কিছু হলে তো এভাবে ডাকে না বুড়ো। আনঅফিশিয়াল কিছু? ওর বুদ্ধি-পরামর্শ ধার নিতে চাইছে? দেখা যাক, ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল। পুরু কার্পেট মোড়া করিডর ধরে বিসিআইয়ের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের ঝকঝকে পালিশ করা বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল।

পেতলের চকচকে নবের দিকে তাকাতেই চিরকাল যেমন হয় এক ঝলক রক্ত ছল্‌কে উঠল বুকের মধ্যে। এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেই ব্যাপারটা ঘটে সব সময়। লম্বা করে দম নিয়ে নক্ করল ও।

'কাম ইন!' দরজার ওপরে ফিট করা স্পীকারে বৃদ্ধের আহ্বান সামান্য ধাতব শোনাল।

ঢুকে পড়ল রানা। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন রাহাত খান। দাঁত দিয়ে চুরুট কামড়ে ধরে আছেন হালকা করে, মুখ নিচু করে কিছু দেখছেন দু'হাতে টেবিলে ভর দিয়ে। কাছে গিয়ে দেখল রানা–দুটো ছবি, পাশাপাশি বিছিয়ে একবার এটায়, একবার ওটায় চোখ বুলাচ্ছেন। নজর তুলে ওকে বসতে বলে আরও কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি, তারপর হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'হাতে কাজ নেই তাহলে···?'

'না, স্যার!' বৃদ্ধের প্রশ্ন পুরো শেষ হতে দিল না ও। 'কোন কাজ নেই। বসে বসে একেবারে···' থেমে গেল বৃদ্ধকে হাত তুলতে দেখে। 'এত কথা শুনতে চাইনি' ধরনের কিছু একটা বোঝাতে চাইলেন তিনি ইঙ্গিতে। সামনের একটা ছবি ঠেলে দিলেন ওর দিকে।

'একে চেনো কি না দেখো তো!'

এক পলক দেখেই মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আরগুয়েলো। প্যাট্রিক আরগুয়েলো। স্প্যানিশ, জন্ম মাদ্রিদে, '৬৮ সালে।'

'কি জানো এর সম্পর্কে?' প্রশংসা ফুটল বৃদ্ধের চেহারায়। যদিও রানা চোখ তোলামাত্র উবে গেল সে-ভাব।

'ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট, স্যার,' বলে চলল ও। 'ইওরোপের বেশ কিছু দেশে ওয়ান্টেড। আমেরিকায় অফিশিয়ালী ওয়ান্টেড নয়, তবে ইওরোপের কয়েকটা দেশ অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, ওদেশে দেখা পেলেই যেন ধরা হয় একে। লোকটার পুরো নাম প্যাট্রিক অলিভিয়েরো আরগুয়েলো, বাপ স্প্যানিশ, মা ব্রিটিশ। প্রেস আর সাধারণ মানুষ তাকে আসল নামে জানে, তবে আমাদের মত সব সংস্থার কাছে সে "র‍্যাবিট" বলে পরিচিত।

'অনেকগুলো সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত। প্রথম এর ওপর মানুষের নজর পড়ে '৭০ সালে, পর পর দুটো ব্রিটিশ বিমান হাইজ্যাক করে আরগুয়েলো। এক সময় রেড আর্মির সাথে কড়া দহরম-মহরম ছিল, তাদের হয়ে অতীতে বিশেষ

করে পশ্চিম জার্মানিতে অনেকগুলো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে লোকটা। বিলুপ্ত বাদের মেইনহফের সাথেও যোগাযোগ ছিল। সরাসরি কোন রাজনৈতিক অ্যাফিলিয়েশন নেই। বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে মাঝেমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রও সাপ্লাই দেয় লোকটা।

'অসংখ্য খুনের অভিযোগ আছে এর বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। বোমা তৈরি আর টেলি কমিউনিকে-শনস্ সিস্টেমের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে।'

'তার মানে নিজের ক্ষেত্রে মুন্সি, কি বলো?' নড়েচড়ে বসলেন রাহাত খান। 'যথেষ্ট রেপুটেড।'

'তা বলা যায়, স্যার।'

বাঁ কনুইয়ের কাছে রাখা বড় একটা বাদামী খাম খুললেন বৃদ্ধ, ভেতর থেকে আরগুয়েলোর আরও চারটে পোস্ট কার্ড সাইজ ছবি বের করলেন। 'এগুলো দেখো।'

দেখল মাসুদ রানা। প্রথমে মনে হলো চারটা চারজনের, কিন্তু একটু ভাল করে তাকাতে বুঝল একজনেরই। একেকটায় একেক ছদ্মবেশে আছে সে। প্রতিটি ছবির নিচে, ডানদিকে ছোট্ট একটা করে স্টিকার সাঁটা, বিভিন্ন তারিখ লেখা তাতে। এ বছরেরই। জানুয়ারি ৪ ও ২৩ তারিখ, ফেব্রুয়ারির ১২ ও ২৫ তারিখ লেখা আছে পরের চারটায়, প্রথমটায় লেখা গত মাসের একটা তারিখ—১৯ জুন। এটায় দাড়ি-গোঁপ লাগানো অবস্থায় আছে আরগুয়েলো।

নিখুঁত ছদ্মবেশ, ভাবল রানা, ও নিজেও ছদ্মবেশ ধারণে কম ওস্তাদ নয়, কোনটা সাধারণ, কোনটা অসাধারণ, বোঝে। বোঝে বলেই মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারল না। তারপর চোখে প্রশ্ন নিয়ে রাহাত খানের দিকে তাকাল।

'গত পাঁচ মাসে পাঁচবার দেখা গেছে একে হিথ্রো এয়ারপোর্টে,' বললেন তিনি। 'ডাবলিন হয়ে হিথ্রো এসেছে আরগুয়েলো। ছবি প্রত্যেকটা হিথ্রোয় তোলা।'

বিস্মিত হলো রানা। পাঁচ মাসে পাঁচবার দেখা গেছে অথচ অ্যারেস্ট করা হয়নি?'

'জানুয়ারিতে যখন প্রথমবার এর দেখা পেল সার্ভেইল্যান্স টীম, কেবল রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করার সময় পেয়েছিল, অপ্রস্তুত ছিল বলে ধরতে পারেনি। ফেরার পথে ধরবে বলে জাল পেতেছিল, তাও হলো না।'

'কেন?'

চুরুটে টান দিলেন রাহাত খান। 'হিথ্রো হয়ে যায়নি সে, কোন্ পথে গেছে জানা সম্ভব হয়নি।'

'তারপর?' ঝুঁকে বসল রানা।

'একই মাসে দ্বিতীয়বার যখন লন্ডন এল আরগুয়েলো, সার্ভেইল্যান্স টীম পিছু নিল। কিন্তু গ্ল্যাসগো পর্যন্ত গিয়ে আবার হারিয়ে ফেলে তাকে। তৃতীয়বার তার পিছু লাগার দায়িত্ব নিল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, জানতে পারল নর্থ-ওয়েস্ট

হাইল্যান্ডের মারকাল্ডি নামে এক গ্রামে গেছে লোকটা। শেষের দু'বার অনুসরণ করে শিওর হলো একই জায়গা তার গন্তব্য, প্রথম দু'দফা ওখানেই গিয়েছিল আরগুয়েলো। গিয়েছিল পর্যন্ত জানে বিএসএস, কিন্তু কোন পথে যে লোকটা বারবার ইংল্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তা এখনও জানতে পারেনি।

'বিএসএসের দুই অফিসার লেগেছিল তার পিছনে, দু'জনকেই এবার খুন করেছে সে। একজনকে হিথ্রো এয়ারপোর্টে, অন্যজনকে কিংস ক্রস রেলস্টেশনে। গুলি করে মেরে রেখে গেছে।'

'আচ্ছা!' বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল ওর।

'গত এক মাসে মারকাল্ডির যেখানে আসা-যাওয়া করছে লোকটা, মানে, যে বাড়িতে, সেটার ওপর নজর রাখতে গিয়ে মারা গেছে আরও দুই বিএসএস এজেন্ট।' চুরুট নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান।

'কে কে, স্যার?' প্রশ্ন করল ও।

বললেন তিনি, তারপর তাকিয়ে থাকলেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা রানার দিকে। জানেন, এদের সাথে কাজ করেছে ও, সবার সাথে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল রানার। ওর কষ্ট অনুমান করার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ।

'মারকাল্ডিতে কার কাছে যায় আরগুয়েলো?' অনেকক্ষণ পর প্রশ্ন করল রানা। 'কেন?'

'এর কাছে যায়,' সামনের দ্বিতীয় ছবিটা এগিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'তবে কেন যে যায়, এখনও জানা সম্ভব হয়নি।'

আগ্রহের সাথে ছবিটা দেখল ও। এক বৃদ্ধের ছবি—ষাটের কম হবে না বয়স। চুল-দাড়ি-গোঁপ সব পেকে সাদা, চোখে কালো ফ্রেমের পুরু কাঁচের চশমা। চওড়া উঁচু কপাল। সব মিলিয়ে প্রতিভাবানদের মত চেহারা, হাজারজনের মধ্যেও সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। বাঁ গাল সামান্য কুঁচকে আছে বৃদ্ধের, মনে হয় ব্যঙ্গের হাসি হাসছে বুঝি।

'এঁকে মনে হয় দেখেছি আগে,' নিচু গলায় আপনমনে বলল ও। 'চেহারা চেনা-চেনা লাগছে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'দেখেছ। খবরের কাগজে—ম্যাগাজিনে প্রচুর ছবি দেখেছ ভদ্রলোকের।'

'কে ইনি?'

'ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সদস্য, ডক্টর রজার সাইমুর।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। 'চিনেছি।' পরক্ষণে চেহারা কুঁচকে উঠল। 'এঁর কাছে আরগুয়েলো কি এমন···' থেমে গেল ও প্রশ্ন অসমাপ্ত রেখে।

'কারণটা এখনও জানা যায়নি।'

'ভদ্রলোক শুনেছি স্কটল্যান্ডের অভিজাত সাইমুর পরিবারের শেষ বংশধর। জমিদার গোছের। বছর দুয়েক আগে ইস্তফা দিয়েছেন চাকরি থেকে।'

'প্রথম দুটো ঠিকই আছে, রানা, কিন্তু শেষেরটা উল্টো। এঁকে আসলে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। আরেক সেন্সে বলা যায় তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে চাকরি

থেকে।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। প্রশ্ন করল না। জানে, এখন নিজে থেকেই সব খুলে বলবেন তিনি। হলোও তাই। শেষ হয়ে আসা চুরুট অ্যাশট্রেতে ফেলে হেলান দিয়ে বসলেন বৃদ্ধ, শুরু করলেন, 'সাইমুর পরিবার স্কটল্যান্ডের অনেক পুরনো আর অভিজাত পরিবার। প্রায় তিনশো বছরের। এদের অফিশিয়াল উপাধি লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। পুরো মারকান্ডি গ্রাম এবং আশেপাশের হাজার হাজার একর জমির মালিক।

'ডক্টর রজার ব্যক্তিগতভাবেও অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানির ডিরেক্টর, রীতিমত বিলিয়নেয়ার। অক্সফোর্ডের নামকরা ছাত্র, প্রতিভাবানদের মধ্যেও সেরা প্রতিভাবান, এক্সট্রা অর্ডিনারি জিনিয়াস।'

থেমে একটু ভাবলেন মেজর জেনারেল, নাকের ডগা চুলকালেন। 'এর মত একজনের সাথে আরগুয়েলোর এমন কি নিয়ে এত গোপন যোগাযোগ চলছে, ভেবে খুব দুশ্চিন্তায় আছে বিএসএস,' বললেন তিনি।

'কিন্তু ডক্টর সাইমুরকে রিজাইন দিতে বাধ্য করা হলো কেন?' জানতে চাইল রানা। 'তাঁর অপরাধ কি, স্যার?'

'বিষয়টা একটু জটিল, রানা। বছর দুয়েক আগে ডক্টর রজার কমিশনের এক মীটিঙে ঘোষণা করল, সে নাকি পারমাণবিক বর্জ্য ডিসপোজালের শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ এক যন্ত্র তৈরি করতে আগ্রহী। ওটা তৈরি করা গেলে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো এখানে-সেখানে বর্জ্য ডাম্প করে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্যে যে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে, তা এড়ানো সম্ভব হবে। রিঅ্যাক্টর ধরনের কিছু একটা আর কি! দ্বিমুখী কাজ করবে ওটা, শক্তি উৎপাদন ও বর্জ্য নিরাপদে ধ্বংস করা, দুটোই। তবে এ জন্যে বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড প্রয়োজন।

'কমিশন তাঁর কাছে ডিজাইন চাইল। জমা দিল সে ডিজাইন। কিন্তু ওটা পরীক্ষা করে কমিশন মত দিল ওতে অনেক খুঁত আছে–চলবে না। অন্য সদস্যদের কেউ কেউ সরাসরি বলে বসল, বর্তমানে চালু বি. ডব্লিউ. আর বা পি. ডব্লিউ. আর সিস্টেমের চাইতে তারটা বরং বিপজ্জনক। ব্যস্, খেপে গেল মানুষটা। দাবি করল, ফান্ড দাও, আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি তোমাদের ধারণা ভুল।

'কিন্তু দাবি করলেই তো আর সব হয় না! কমিশনের অন্য সদস্যরা কম বোঝে না ওসব, তাদের কেউই সমর্থন করছে না ডক্টর সাইমুরের দাবি, সেক্ষেত্রে কমিশন কি করতে পারে? তবু বিষয়টা নিয়ে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করে ওরা, তাতেও দেখা গেল সব ভোট সাইমুরের বিপক্ষে পড়েছে। পক্ষে পড়েনি একটাও।'

'তাই বাধ্য হয়ে কমিশন রিজেক্ট করল তাঁর প্রস্তাব,' বলে উঠল রানা।

'ঠিক। রেগেমেগে একাকার কাণ্ড করল বিজ্ঞানী। তার ধারণা সবাই তার রেপুটেশনকে হিংসে করে, তাই কাজটা করতে দিল না। পরিস্থিতি এমন হলো যে কমিশন এক সময় ডক্টর সাইমুরকে রিজাইন করতে নির্দেশই দিয়ে বসল বাধ্য হয়ে, নইলে আর সব সদস্যরা একযোগে রিজাইন করবে বলে হুমকি দিয়ে বসে আছে।'

'তারপর?'

'রিজাইন দিল ডক্টর সাইমুর, লন্ডন ছেড়ে ঢুকল গিয়ে নিজের দুর্গে। তারপর বহুদিন খবর ছিল না, কি বুদ্ধি পাকিয়েছে ভেতরে বসে বসে, কে জানে? হঠাৎ করে আরগুয়েলোর তার ওখানে আসা-যাওয়া শুরু হলো। এসব দেখে বেশ চিন্তায় আছে বিএসএস। কি চলছে ওখানে, জানার কয়েকটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওদের। দুটো সন্দেহ জেগেছে ওদের এ নিয়ে। হয় ডক্টর সাইমুরের বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আরগুয়েলো বড় ধরনের কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে চলেছে, নয়তো বিজ্ঞানী নিজেই তার কোন অশুভ তৎপরতা সফল করতে তার সাহায্য চেয়েছে। পরেরটার সম্ভাবনাই বেশি।'

রাহাত খান আর কথা বলছেন না দেখে একটু পর প্রশ্ন করল ও, 'আমাকে কি করতে বলেন, স্যার?'

'ভাবছিলাম,' ডানদিকের জুলফি চুলকালেন তিনি। 'তোমার হাতে তো কোন কাজ নেই, ওদিকে বিএসএস চীফ লংফেলো এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য চেয়েছে, যদি সম্ভব হয় আর কি! তাই···' ইচ্ছে করেই থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

'আমি যাব, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ও। 'কবে যেতে হবে?'

'যেতে চাইলে আর দেরি কেন? আজই যাওয়া যায়।'

'তাই যাব, স্যার।'

ওর ভেতরের অস্থিরতা টের পেয়ে মনে মনে হাসলেন রাহাত খান। ও ঠিক আমার মত হয়েছে, ভাবলেন। তাঁরও এক সময় এই বয়স ছিল, যখন বিপদ আর রোমাঞ্চের গন্ধ নাকে গেলেই রক্তে বান ডাকত, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে যেতেন তিনি পাঞ্জা লড়তে। মাসুদ রানাও তাই।

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও গিয়ে। সন্ধের পর ফ্লাইট। টিকেট আর কাগজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'জ্বি, স্যার,' উঠে পড়ল ও।

'রানা!' গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন বৃদ্ধ।

'স্যার?'

'সতর্ক থেকো। খুব সতর্ক থেকো। বেপথে এক পা ফেললেই···' এবারও ইচ্ছে করে থেমে গেলেন।

'থাকব, স্যার!'

'লন্ডন পৌঁছে মারভিন লংফেলোর সাথে দেখা কোরো। ও তোমাকে ব্রীফ করবে বাকি সব। গুড লাক!'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ঠিক একই মুহূর্তে কয়েক হাজার মাইল দূরে আর একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। লন্ডনের প্রায় পাঁচশো মাইল উত্তরের এক দুর্গের গোপন দরজা ওটা, ভেতরে ঢুকল ছোটখাট এক মানুষ। চুল-দাড়ি-গোঁফ সব সাদা তার। প্রতিভাবানদের মত চেহারা।

তাকে দেখে ভেতরে বসা এক লোক উঠে দাঁড়াল সসম্মানে। বড় এক মিলিটারি ডেস্কের উল্টোদিকে পুরু গদিমোড়া চেয়ারে বসেছিল সে। প্যাট্রিক

অলিভিয়েরো আরগুয়েলো তার নাম। এই নিয়ে ছ'বার ঢুকল সে এ দেশে। আগের সফরের সময় কিছু সমস্যা হয়েছে, কয়েকটা খুন-টুন করতে হয়েছে তাকে, পরে আরও দু'জন মরেছে, তবে তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই আরগুয়েলোর। তারপরও যে সে আবার ইংল্যান্ডে ঢুকতে পেরেছে, পৌঁছতে পেরেছে জায়গামত, তাতেই সন্তুষ্ট।

খুন-খারাবি, টিকটিকি পিছু লাগা, এসব কোন বিষয়ই নয় তার কাছে। পরোয়া করে না। ছোট ছোট পায়ে কাছে এসে ডান হাত বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, প্যাট্রিক।' শেষ নামটা একটু বড় বলে তাকে সবসময় প্রথম নাম ধরে ডাকে সে।

'আমিও,' হেসে তার হাত ঝাঁকিয়ে দিল লোকটা। 'অনেকদিন হলো আপনার সাথে পরিচয়। কিন্তু আপনাকে কি বলে যে ডাকব, ভেবে ঠিক করতে পারিনি। লেয়ার্ড, নাকি···'

'ওয়ারলক নামটা পছন্দ হয়?' বলল পক্কেশ। হাসল ফিক্ করে। 'আমার কিন্তু ভারি পছন্দ।'

'ঠিক বলেছেন,' সে-ও হাসল। 'একদম উপযুক্ত নাম। বেশ, আজ থেকে তাই ডাকব আপনাকে।'

ডেস্কের ওপাশে নিজের বিশাল সুইভেল চেয়ারে বসল বৃদ্ধ, পুরু কাঁচের ওপাশ থেকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখল। ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে, অনেকটা পাখির মত। ওটা তার অভ্যেস। 'এবার কোন সমস্যা?'

'নাহ্! আপনার চপার ঠিক সময়ে পৌঁছেছে। পিছনে কোন লেজও ছিল না এবার।'

'গুড,' আরেক দফা পাখি-নড করল সে। 'আশা করছি এটাই তোমার শেষ সফর হবে এখানে।'

হাসি দফায় দফায় মিলিয়ে গেল আরগুয়েলোর চেহারা থেকে। 'কিন্তু আমার পেমেন্টের ব্যাপারটা···'

'নিশ্চই নিশ্চই!' দ্রুত বলে উঠল বৃদ্ধ। 'ওটা তো আছেই। সে যাক, এবার দু'চারদিন থাকতে হচ্ছে তোমাকে। সমস্ত কিছু চূড়ান্ত করতে হবে।'

'তাতে অসুবিধে নেই। আমি তৈরি হয়েই এসেছি।'

একটা পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করতে লাগল পরমাণু বিজ্ঞানী। 'ইওরোপের খবর বলো, সব রেডি?'

'সব রেডি,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল লোকটা।

'আমেরিকায়?'

'ওখানেও। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ওরা।'

গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখল বৃদ্ধ। 'কারও ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তো তোমার, প্যাট্রিক?'

'প্রশ্নই আসে না!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওরা প্রত্যেকে আপনার স্বপ্ন সফল করতে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করবে, কিন্তু পিছপা হবে না। কেউ কেউ এখনই নিজেকে মৃত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা কেবল একটাই নিশ্চয়তা চায়, কাজ

শেষে যে যার ন্যায্য পাওনা পাবে কি না। এছাড়া আর কোন সমস্যা আমি অন্তত দেখি না।'

'গুড!' বলে চিন্তায় ডুবে গেল বৃদ্ধ।

নিজের চারদিকে তাকাতে লাগল আরগুয়েলো। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার এসেছে সে এখানে, রীতিমত প্রেমে পড়ে গেছে রুমটার। ভেতরের বহু-মূল্যবান জিনিসপত্র যত দেখে, ততই লোভ জাগে।

রুমটা সাইমুর ক্যাসেলের আন্ডারগ্রাউন্ডে, বিরাট–প্রায় বাস্কেটবল মাঠের মত। সিলিঙ যথেষ্ট উঁচুতে। দুই দেয়াল সিলিঙ সমান উঁচু বুক শেলফের আড়ালে পড়ে আছে। শেলফ বোঝাই মোটা মোটা দামী সমস্ত বই। বেশিরভাগই বিজ্ঞানের। ফিশিং আর হান্টিঙের ওপরেও আছে কিছু।

রজার সাইমুরের ঠিক পিছনেই আছে আরেকটা গ্লাস কেবিনেট। এটা একটু ছোট। ভেতরে রয়েছে আক্ষরিক অর্থেই অমূল্য সমস্ত অ্যান্টিক অস্ত্রশস্ত্র। খাঁটি রূপোর তৈরি একজোড়া ফ্লিন্ট-লক পিস্তল, এক সেট আমেরিকান কেন্টাকি হ্যান্ড গান, মাদার অভ পার্ল ও সোনার তৈরি ফ্রেঞ্চ হুইল-লক, একজোড়া কাটলাস পিস্তল, ছয়টা রিভলভিং ব্যারেলসহ আরও অসংখ্য এটা-ওটা।

এসবের মূল্য বোঝে সন্ত্রাসী আরগুয়েলো। জানে লন্ডনের যে কোন নিলাম ঘরে অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি হবে এসব।

'আমার তরফ থেকে ওদের পেমেন্টের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছ নিশ্চই?' বলল রজার সাইমুর।

ওপর-নিচে মাথা দোলাল স্প্যানিশ। 'দিয়েছি। তবু, এসব ব্যাপারে শেষ দিকে অনেক সময় পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়, বোঝেনই তো! তাই ওরা একটু···ইয়ে···'

'বুঝি। ওদের বোলো, আমার প্ল্যানের বেলায় পরিস্থিতি একচুল এদিক-ওদিক হবে না। আমি যেভাবে বলেছি, ঠিক সেভাবেই ঘটবে সব। কেউ কিছু করার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারবে না। আমি জানি আমি কি করছি,' কথাটা খুব জোর দিয়ে, থেমে থেমে বলল লোকটা। 'ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকাও বুঝবে একদিন। ওরা জানে, দাবি পূরণ করা না হলে আমি যা করব, তার পরিণতি পৃথিবীর জন্যে, মানব সভ্যতার জন্যে কতবড় সর্বনাশা হবে। যখন ওরা বুঝবে ওদের কিছু করার নেই, তখন···' আপনমনে হেসে উঠল বিজ্ঞানী।

প্রথমে নিঃশব্দে, তারপর গলা ছেড়ে। ওই হাসির মধ্যে অশুভ কিছু আছে টের পেয়ে বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী আরগুয়েলো পর্যন্ত মনে মনে কুঁকড়ে গেল। কিন্তু সামলে নিল কোনমতে, কারণ এখন ভয় পেয়ে লাভ নেই। বিজ্ঞানীর সাথে তাল মিলিয়ে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে সে।

এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে পিছিয়ে আসার পথ নেই। কেবলই এগিয়ে যেতে হবে এখন। নিয়তির দিগন্তের ওপারে কি আছে, দেখার জন্যে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

এর কোন বিকল্প নেই।

তিন

বিএসএস, লন্ডন। মারভিন লংফেলোর মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। হাতে তিনটে ছবি—একটা রজার সাইমুরের, অন্য দুটোর একটা এক মাঝবয়সী মহিলার, অন্যটা অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীর।

মহিলার ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে বয়স, চমৎকার চেহারা। পিম, লম্বাটে ফিগার। মাঝপিঠ পর্যন্ত কালো, ঘন চুল। বড় বড় চোখ, তবে চাউনি সরল নয়—বরং একটু কঠিন। জ্ঞানী মানুষের মত লাগে দেখতে। ছোট, লোভনীয় দুই ঠোঁটে ফুটে আছে আমন্ত্রণের হাসি।

'মিস মে হরোইৎজ,' বলে উঠলেন লংফেলো। 'সাইমুরের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। ট্রেইনড্ ফিজিসিস্ট। সাইমুরের মত এ-ও কেমব্রিজের ছাত্রী। প্রায় এক যুগ হতে চলল এক সঙ্গে আছে দু'জন, যেখানেই যাক বিজ্ঞানী, সে থাকবেই সাথে। সোজা কথায় তার রক্ষিতা।'

মাথা দুলিয়ে পরের ছবিতে মন দিল ও। মে-র তুলনায় অনেক কম বয়স এ মেয়েটির, বিশ-একুশ। এক কথায় অপরূপা। মিষ্টি চেহারা, চাউনি নিষ্পাপ। মুখটা ডিমের মত, চুলের রঙ চকচকে সোনালী। মসৃণ, লাবণ্য ভরা ত্বক। চোখ দুটো বেশ বড়, তার ওপরে ধনুকের মত বাঁকা, সরু ভুরু। ক্যামেরার সামান্য ডানে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, হাসছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুটো ঝকঝকে দাঁতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা।

'এ হচ্ছে রজার সাইমুরের ভাইঝি, মিস রোজালিন সাইমুর, বা রোজি,' বললেন তিনি। 'সাইমুরদের শেষ বংশধর। বেশ কয়েক বছর আগে সিসিলিতে এক প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে ওর মা-বাবা।'

সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানলেন কিছুক্ষণ লংফেলো। অন্যমনস্ক। 'জানা গেছে একে কড়া শাসনে রাখে রজার। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি বেচারী, প্রাইভেট টিউটর বাড়িতে গিয়ে পড়িয়েছে। একা দুর্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। বের হয় অবশ্য মাঝেমধ্যে, তবে চাচার সাথে। একদল পোষা কুকুরের পাহারায়।'

'পোষা কুকুর?' প্রশ্ন করল রানা।

'বডিগার্ড আরকি!' চেহারা বিকৃত করলেন বৃদ্ধ। 'বাছা বাছা স্কটিশ দানব একেকটা। সব সময় ছায়ার মত লেগে থাকে রজারের সাথে। ওদের যে চীফ, তার আকার-আকৃতি প্রায় গরিলার মত, রানা। নাম পিটার।'

আবার কিছু সময় চুপ করে থাকলেন তিনি। কপালে গভীর কুঞ্চন। 'রজারের সাথে আরগুয়েলোর গোপন যোগাযোগের পিছনে কারণ যাই হোক, সেটা যে ভয়ঙ্কর কিছু, তাতে কোন সন্দেহ নেই, রানা। ভেবে দেখো, এক মাসের সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যে চার-চারজন অপারেটর হারিয়েছি আমি। অপূরণীয় ক্ষতি

হয়ে গেল আমাদের। সন্দেহ হচ্ছে আমাদের বেশিরভাগ অপারেটরকে চেনে ওরা। কি করে, ঈশ্বরই জানে। পরেরবার যাকে পাঠাব, তারও হয়তো পরিণতি একই হবে। কাল আবার এসেছে আরগুয়েলো, মারকাল্ডি গেছে। দূর থেকে ওকে অনুসরণ করেছে আমার লোক, ধারেকাছে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু দূর থেকে কাজ হবে না, রানা, রজারের কাছে পৌঁছতে হবে, তাই বাধ্য হয়ে তোমার সাহায্য চেয়েছি।'

'বুঝলাম,' চিন্তিত রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু তার কাছে যাব কি করে, স্যার? সে ব্যাপারে ভেবেছেন কিছু?'

'ভেবেছি,' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে ঝুঁকে বসলেন বিএসএস প্রধান। 'খুব শিগ্‌গিরই লোকটার কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ আসবে, রানা। সেটা কাজে লাগানো সম্ভব।'

'কি ধরনের সুযোগ?'

পরে বলছি। ওটা যদি কাজে লাগাতে পারো, রজার সাইমুরের কাছে পৌঁছে তাকে প্রভাবিত করতে পারো, তাহলে খুব সম্ভব তার ক্যাসেলে ঢোকার একটা সুযোগ তুমি পাবে।'

'ওর মত একজন ঘুঘু লোককে প্রভাবিত করা নিশ্চই কঠিন হবে।'

'সে ব্যবস্থা আমি করব,' তাড়াতাড়ি বললেন বৃদ্ধ। 'তোমার নতুন ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে দেব আমি। পরিচয়ের পরে যদি তোমার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়, যে সব তথ্য লোকটা পাবে, তাতে আর কিছু না হোক, অন্তত অখুশি হবে না। সে ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় কিছু না কিছু প্রভাবিত হবেই। চাই কি খুশিমনে এক-আধটা কাজের অফারও দিয়ে বসতে পারে তোমাকে।'

খানিকটা সময় চুপ করে থাকল ও। 'সুযোগটা কখন, কোথায় পাচ্ছি আমি, স্যার?'

'আগামী সপ্তায়, অ্যাসকট হর্স রেসের মাঠে। ওখানে যাবে রজার সাইমুর, মে আর রোজিকে নিয়ে।'

রোজমেরির ছবি দেখছিল ও। চোখ তুলে লংফেলোর দিকে তাকাল। 'শিওর যাবে তো?'

'নিশ্চই! বাৎসরিক গোল্ড কাপ রেস হতে যাচ্ছে ওখানে, রানা। রজারের নিজের ঘোড়া ব্লু চায়নাও অংশ নেবে। ঘোড়ার নামের তালিকা আছে আমার কাছে।'

ওপর নিচে মাথা দোলাল রানা।

'তবে রজারের সাথে পরিচয়টা কষ্ট করে তোমাকেই করে নিতে হবে। আমি অবশ্য পথ বলে দেব। হাতে কয়েকদিন সময় আছে, এর মধ্যে প্র্যাকটিস কিছুটা ঝালিয়ে নিলে…'

'প্র্যাকটিস!' চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'কিসের?'

অমায়িক হাসি দিলেন মারভিন লংফেলো। 'এই পকেট মারা বিদ্যের মতই অনেকটা আরকি!'

'অ্যাসকট ৫ মাইল' লেখা মাইল স্টোন সাঁ করে পিছিয়ে গেল। আর ঘণ্টা দেড়েক

আছে রেস শুরু হতে। প্রশান্ত মেজাজে গাড়ি ড্রাইভ করছে রানা, এক হাতে স্টিয়ারিঙ হুইল ধরা, অন্য হাতে সিগারেট পুড়ছে। গত প্রায় এক সপ্তাহ দু'আঙুলের কারবার নতুন করে, খুব ভাল ভাবে প্র্যাকটিস করেছে ও কাটপার্সের 'দ্য স্কিলস্, আর্টস অ্যান্ড সিক্রে টস্ অভ দ্য ডিপ' পড়ে।

পকেট মারা বিদ্যের অনেকগুলো কৌশলের সাথে বইটায় নেকলেস লোপাট করার কায়দাও আছে, সবচেয়ে কঠিন কাজ। ওটাই শিখেছে রানা। শুধু শেখেনি, মডেলের সাহায্যে খুব ভালমতই প্র্যাকটিস করেছে। লংফেলোর দেয়া তথ্য যদি সঠিক হয়, যদি রেস দেখতে সাইমুরের সাথে তার ভাইঝি আসে, তাহলে এ বিদ্যা কাজে লাগবে। নিজের ওপর আস্থা আর বিশ্বাসের অভাব নেই রানার, জানে, ও সফল হবেই।

'অ্যাসকট ৪ মাইল' পোস্ট পেরিয়ে গতি কমাতে বাধ্য হলো ও, সামনে বেন্টলি, রোলস রয়েস আর ডিমলারের লম্বা লাইন। সবাই চলেছে রেস কোর্সের দিকে। আরও খানিকদূর এগোতে একটু একটু অস্বস্তি লেগে উঠল। মনে হলো গলার মধ্যে কোথাও গিট লেগে গেছে। বাতাসে বিপদ আর রক্তের দূরাগত গন্ধ। তবে যত বড় আর ভয়ঙ্কর বিপদই হোক, মোকাবেলা করার সবধরনের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে রানা, এই যা সান্ত্বনা।

একেবারে বোঝাই কার পার্কে গাড়ি রেখে নামল ও। কোটের ল্যাপেলে জ্বল জ্বল করছে রয়্যাল এনক্লোজারে ঢোকার পাস। ও ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে রানী মা ও প্রিন্স ফিলিপ পৌঁছলেন, তারপর রাজকীয় পরিবারের অন্য সদস্যরা। রেসে রানীমার ঘোড়া অংশ নিচ্ছে। ওটাই ফেভারিট। এছাড়া আছে ফ্রান্সিস ফলি, ডেসমন্ড'স ডিলাইট এবং সফট সেন্টারসহ আরও ছয়টা। সবার শেষে সাইমুরের চার বছর বয়সী চায়না ব্লু। প্রথম চারটের ওপর বাজী ধরা হয়েছে বহু টাকার। আর সব আছে শুধুই প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়াতে।

গত কয়েকটা রেসের রেকর্ড অনুযায়ী আজকের রেসে কোন চান্সই নেই চায়না ব্লুর। প্রথম চারটের ধারে কাছেও আসতে পারবে না। বুকমেকারদের হিসেবে আজ ওটার জয়ের সম্ভাবনা শতকরা মাত্র চার ভাগ। তবু ওটার ওপরই বাজী ধরার সিদ্ধান্ত নিল রানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কাছের বুকমেকারের স্টলের দিকে। একশো পাউন্ডের কড়কড়ে পাঁচটা নোট ঠেলে দিল গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। 'চায়না ব্লু,' বলে হাসল।

রসিদ বই বের করে লেখা শুরু করতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা, ভুল শুনেছে ভেবে মুখ তুলে তাকাল। 'এক্সকিউজ মি, স্যার?'

'চায়না ব্লু।'

নোটগুলো দেখল লোকটা। দ্বিধায় পড়ে গেছে। 'এতগুলো টাকা পানিতে ফেলতে চান, মিস্টার?'

মাথা দোলাল রানা। 'উহুঁ! আরও পনেরো হাজার ফেরত পেতে চাই।'

'ওয়েল, স্যার,' শ্রাগ করল সে। 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনি শেষ পর্যন্ত হতাশ হবেন।'

টিকেট নিয়ে এনক্লোজারে ঢুকে পড়ল ও। হাঁটাহাঁটি করতে লাগল ভিড়ের

মধ্যে। পুরুষ আর মেয়ে দর্শকের অনুপাত প্রায় সমান মনে হলো, মেয়েরা জবরজঙ ফ্যাশনেব্‌ল্ ড্রেস আর চওড়া কার্নিসের হ্যাট পরে ঘুরঘুর করছে পুরুষ সঙ্গীদের বাহু ধরে। কিশোরী থেকে বুড়ি পর্যন্ত। অনর্গল বক্ বক্ করে চলেছে।

এ মুহূর্তে নিরস্ত্র মাসুদ রানা, প্রিয় ওয়ালথার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে রেখে এসেছে। সাথে আছে কেবল একটা বিশেষ কলম–ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট ডিভাইস।

হাঁটতে হাঁটতে নিরিবিলি দেখে বড় এক গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল ও, তাকিয়ে থাকল কাছের গোল প্যাডকের দিকে। প্রতিযোগী প্রায় সব ঘোড়াই আছে ওখানে, ট্রেইনার, জকি ও স্টেবল-বয়রাও আছে নিজ নিজ ঘোড়ার সাথে। চায়না ব্লুকে ওর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে কিছু সময় লাগল। প্যাডকের ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ওটা প্রবল প্রতাপশালীর মত। আপোসহীন, দুর্জেয় ভঙ্গিতে। অন্যগুলোকে ওটার পাশে ম্লান লাগছে।

অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কপালে মৃদু কুঞ্চন ফুটল। কেন যেন মনে হলো, আজ একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে চায়না ব্লু। গত কয়েকটা রেসের রেজাল্ট যা-ই হোক, আজ অন্য কিছু ঘটবে। প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলল, ওটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা চোখে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায় সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে। দীর্ঘদিন ধরে জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রানার এই অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ণ, অনেক শানিত হয়েছে, বিপদ-আপদ বা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটে বসার আগে তাই টের পেয়ে যায় ও। আজও পেল–বুঝল চায়না ব্লু জিতবেই।

কিন্তু কিভাবে? অস্বস্তি লেগে উঠল। আজকাল ইংল্যান্ডে ঘোড় দৌড়ে কোনরকম ঠগবাজি চলে না, তাছাড়া সেরকম কিছু রজার সাইমুর করবে বলেও মনে হয় না। এতবড় এক প্রতিযোগিতায় ডোপিং বা অন্য কিছু করে নিজের ঘোড়া জেতাবার ঝুঁকি সে নেবে না, ধরা পড়লে সর্বনাশ ঘটে যাবে। তারপরও রানা একশো ভাগ নিশ্চিত, আজ জিতবেই চায়না ব্লু।

অজানা এক রোমাঞ্চে গায়ে কাঁটা দিল ওর, ঘাড়ের কাছের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। তখনই চোখ পড়ল এক পক্বকেশ বৃদ্ধ ও দুই মেয়ের ওপর। প্যাডকের ভেতরে ঢুকেছে তারা, চায়না ব্লুর দিকে এগোচ্ছে। হ্যাট খুলে ঝুঁকে তাদের নড করল ওটার ট্রেইনার। পাখির মত চকিত মাথা দুলিয়ে জবাব দিল বৃদ্ধ। এই প্রথম সামনাসামনি দেখল ও বিজ্ঞানীকে।

পকেট থেকে বিএসএসের সরবরাহ করা প্যাডকের গেট পাসটা অনুভব করল রানা। ঘোড়ার মালিকদের বিশেষ পাস ওটা–জাল। ভেতরে প্রচুর মানুষ। প্রতিটি ঘোড়ার সাথে কম করেও তিনজন তো রয়েইছে, সাথে সপরিবারে মালিকরাও। এরমধ্যে রানা কোন্ ঘোড়ার মালিক, কেউ জিজ্ঞেস করতে আসবে না আশা করা যায়।

দ্রুত এগোল ও প্যাডকের গেটের দিকে। যেন ভারি ব্যস্ত, এমনভাবে সিকিউরিটি গার্ডের নাকের সামনে পাসটা দুলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুড়ুৎ করে। ওটা ভালমত দেখার বা ওকে দাঁড় করিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবলও না পর্যন্ত লোকটা, হলুদ পাস দেখেই সন্তুষ্ট। ভেতরে এসে যথেষ্ট কাছ

থেকে বৃদ্ধকে দেখল রানা। স্টিল ছবিতে কারও হাঁটাচলা বা অঙ্গভঙ্গি ধরে রাখার উপায় নেই, থাকলে চেহারার সাথে লোকটার সে সবও জানা থাকত। নতুন করে তার সম্পর্কে হিসেব-নিকেশ করতে হত না।

টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। হাঁটে ছোট ছোট, দ্রুত পদক্ষেপে, অনেকটা ছাগলের বাচ্চার মত–এ ছাড়া আর কোন যোগ্য তুলনা খুঁজে পেল না ও। মাথা, হাত, আঙুল, ঘাড়, সবকিছুর মুভমেন্টও তেমনি দ্রুত, চকিত। সব মিলিয়ে মানুষটাকে ভূচর পাখির মত লাগে। স্কটিশ চীফটেইনের সহজাত গাম্ভীর্য বা ধীরস্থির ভাব, কিছু নেই–সারাক্ষণ ছট্‌ফট্ করছে। হঠাৎ দেখলে যে কারও চোখে দৈহিক প্রতিবন্ধী মনে হবে তাকে।

অথচ এতকিছুর আড়ালেও যে লোকটার মধ্যে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আছে, ব্যাপারটা ওর নজর এড়াল না। তার সঙ্গী দুই মেয়ে একই ডিজাইনের ড্রেস পরেছে, রঙ আলাদা। ভি-গলার ক্লাসিক ড্রেস, ওপরে খাটো, পীভলেস জিলেট।

রোজালিনের দিকে নজর দিল রানা। ছবির চাইতে বহুগুণ সুন্দরী মেয়েটি। পাঁচ ফুট সাত, পিম ফিগার। হাসছে চায়না ব্লুর দিকে তাকিয়ে। মৃদু বাতাসে বুক ফাড়া জিলেট বারবার সরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে উন্নত বুক আর মোহায়ের মুক্তো বসানো মহামূল্যবান নেকলেস। মারভিন লংফেলোর সূত্র যদি সত্যি হয়, তাহলে ওটার দাম পাঁচ লাখ পাউন্ড।

রোজালিনের বাবা রবার্ট সাইমুর বিয়ের সময় স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল ওটা। বেশির ভাগ সময় ব্যাঙ্কের ভল্টেই পড়ে থাকত, বিশ বছর পূর্তির দিন উত্তরাধিকার সূত্রে রোজালিনের গলায় উঠেছে। আজকাল প্রায় সব বড় অনুষ্ঠানে ওটা পরে আসে মেয়েটি। মুচকে হাসল রানা, উপযুক্ত গলাতেই জায়গা হয়েছে নেকলেসটার, ওর মত অপূর্ব সুন্দরীকেই মানায় মোহায়ের পার্ল।

ভাল্ করে ওটা দেখে নিল রানা। দুদিক থেকে নেমে আসা তিনটে করে খাটো সোনার দড়িতে ঝুলছে আসল জিনিস। দুই কানের কাছে এক হয়ে গেছে দড়ি, পিছনে এক নকশা করা খুদে সোনার বাক্সের মধ্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়েছে। ছোট্ট এক লিভারে চাপ পড়লে ভেতরের স্প্রিঙের ধাক্কায় খুলে যাবে বাক্স, তারপর···।

রজার সাইমুরকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল ও। দুই সঙ্গিনীর সাথে কথা বলছে। তার ট্রেইনার চায়না ব্লুর জকির কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলছে–রেস জেতার অব্যর্থ কৌশল বোধহয়। পিছনে সদম্ভে দাঁড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য চায়না ব্লু, চকচকে চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ছে যেন শক্তির ছটা। প্যাডক এন্ট্রান্সের কাছে এসে দাঁড়াল রানা, ভেতরের লোকজন সব বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

কাঁধে ঝোলানো যেইস লেন্সের শক্তিশালী ফিল্ড গ্লাসের ফিতে আরেকটু ওপরে তুলল ও, আসল সময় হাজির বুঝতে পেরে হার্টবিট একটু বেড়ে গেছে। গলা শুকিয়ে আসছে। ওদিকে সব ঘোড়ায় জিন চাপানো শেষ, একটা-দুটো কোর্সের গেটের দিকে রওনাও হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে চায়না ব্লুর জকিকে এক পলক দেখতে পেল রানা। চেহারায় প্রবল আত্মবিশ্বাস। আবার সেই চিন্তা পেয়ে বসল ওকে–কি ভাবে জিতবে চায়না ব্লু? কোন্ অলৌকিক শক্তির বলে?

নিজের চারদিকে ভিড়ের চাপ অনুভব করল ও। ক্রমেই বাড়ছে। ঘোড়ার মালিক, পরিবারের সবাই, বন্ধু-বান্ধবসহ জকি বাদে অন্য কর্মচারীরা সবাই একযোগে সরু গেটের মুখে এসে জড়ো হয়েছে। রজার আর মের কাছ থেকে হয়তো ভিড়ের চাপেই পিছিয়ে পড়ছে রোজালিন, তাই দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, দ্রুত কয়েক পা সরে এসে মেয়েটির ঠিক পিছনে দাঁড়াল। তার সাথে তাল রেখে এক পা এক পা করে এগোল গেটের দিকে।

পেট মোটা বোতলের সরু গলা দিয়ে ঘন কিছু বের করার সময় জিনিসটার গতি যেমন খুব ধীর হয়ে যায়, তেমনি হয়েছে গেটের অবস্থা। প্যাডকের চওড়া পেট থেকে অনেকে একসাথে বের হতে গিয়ে আটকে গেছে সরু মুখে। সবাই তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চায় নিজেদের বক্সে, অথবা গ্যালারিতে। গেটের কয়েক গজ ভেতরে বলতে গেলে থেমেই আছে মানুষ, পিঁপড়ের মত এগোচ্ছে। একদম চোখের সামনে রোজালিনের নেকলেসের বক্সটা দেখতে পাচ্ছে রানা এখন—মাত্র দু'হাত সামনে।

ওর গায়ের মিষ্টি সুবাস নাকে আসছে। মিলি ডি প্যাটো, ভাবল রানা, বাজারের সবচেয়ে দামী সেন্ট। এতই দামী যে এক শিশি কিনলে সঙ্গে একটা সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়। পিছন থেকে অরেকটু ধাক্কা খেতে রানার নাক রোজালিনের চুলে ঠেকে যাওয়ার অবস্থা হলো। আশেপাশে তাকিয়ে অবস্থা বুঝে নিল ও। অসুবিধে নেই, কেউ নিচে দেখছে না, দেখছে ওপরে। থুতনি উঁচু করে সামনের বাধার ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে গেট কতদূর।

চট্ করে বাঁ হাত তুলল রানা, তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে রোজালিনের নেকলেসের ক্ল্যাস্প্ বক্সটা আলতো করে ধরে আধ ইঞ্চিমত ওপরে তুলে ফেলল, যাতে আসল সময়ে ঘাড়ে আঙুলের ছোঁয়া না লেগে যায়। দুই আঙুলের ভেতরদিক দিয়ে জিনিসটা একবারের চেষ্টায় আটকে ধরে তোলা, ওটাই মূল—পরের কাজ সহজ। অন্য হাতের মধ্যমা দিয়ে নাকের ডগা চুলকাল রানা, হাত নামাবার সময় তর্জনীর নখ দিয়ে খুদে লিভারে চাপ দিল, লাফিয়ে খুলে গেল ক্ল্যাসপ বক্সের নকশা করা ঢাকনা। তার মেরুদণ্ডের ভাঁজের কাছে গোল এক রিঙের সাহায্যে আটকে আছে ওপাশের দড়ির মাথা।

চাপটা দিয়েই বক্স গলিয়ে দিল ও রিঙের মধ্যে দিয়ে—অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। বিএসএসের এক মেয়ে অফিস কর্মীর গলায় ঠিক এইরকম বক্সওয়ালা নেকলেস পরিয়ে কয়েকদিন অবিরাম প্র্যাকটিস করেছে রানা। শেষের তিন দিন কিছুই টের পায়নি সে, রোজালিনও পেল না। রিঙের মধ্যে দিয়ে বক্স গলিয়ে দিতেই দুই দড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ও দুটো ছেড়ে হাত নামিয়ে নিল রানা। রোজালিনের বুকের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিঃশব্দে টার্ফের ওপর পড়ল মোহায়ের পার্লের নেকলেস, একই মুহূর্তে তার ওপর পড়ল রানার ফিল্ড গ্লাস। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিনিস দুটো তুলল ও এক হাতে, মুহূর্তের জন্যে ব্রেক কষল পিছনের ভিড়, তারপর আবার নড়ে উঠল। রোজালিনের নেকলেস ততক্ষণে সবার অলক্ষে রানার কোটের সাইড পকেটে চালান হয়ে গেছে।

এরপর ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে সাইমুরের পার্টিকে অনুসরণ করে ট্যাটারসাল

স্ট্যান্ডের দিকে এগোল ও। এরমধ্যে জোর পায়ে চাচার পাশে পৌঁছে গেছে মেয়েটি। মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, নিজেদের বক্সে না পৌঁছানো পর্যন্ত গলার দিকে যেন নজর না যায় ওর। স্ট্যান্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল দলটা, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে লম্বা একসার খোপ-খোপ বক্সের পিছনের করিডরে চলে গেল। ওদিকে একটা একটা করে কোর্সে ঢুকছে ঘোড়া, দর্শক হৈ-হৈ শব্দে তাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পর স্ট্যান্ডে ঢুকল রানা, ধীরেসুস্থে এগোল সাইমুরের বক্সের দিকে। বন্ধ দরজার কাছে এসে পকেট থেকে জিনিসটা বের করল, নক্ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে সবাই, নজর কোর্সের স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। অন্য প্রতিযোগীদের মাঝে চায়না ব্লুকেও দেখতে পেল রানা ওখানে।

খুক্ করে কাশল ও। 'মাফ করবেন।'

একযোগে ঘুরে তাকাল তিনজন। 'ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত,' বলল ও নেকলেস ধরা খোলা হাত সামনে বাড়িয়ে, নজর রোজালিনের ওপর। 'মনে হয় এটা আপনার গলায় দেখেছি আমি। করিডরে পড়ে ছিল, বোধহয় খুলে পড়ে গেছে। আপনারই তো···?'

গলা দিয়ে চাপা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটির, ডান হাত চট্ করে উঠে গেল গলায়। পরক্ষণে আরেক অস্ফুট গোঙানি, 'ও মাই গড!'

'কেমন, দেখলে তো?' চাপা গলায় বলে উঠল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। পরক্ষণে পাখির মত ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে রানাকে দেখল। 'ঠিকই ধরেছেন, স্যার। জিনিসটা ওরই। আমার ভাইঝি,' হাসল সে। রোজালিনকে দেখল। 'ওকে আমি প্রায়ই বলি এত দামী জিনিস পরে যেখানে-সেখানে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে। আজ মনে হয় বিশ্বাস হবে ওর।'

'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব,' চকের মত সাদা চেহারা করে হাত বাড়াল রোজালিন, নেকলেসটা নিয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল। 'ঠিক···'

বাধা দিল বৃদ্ধ। 'আর কিছু না হোক, এখানে আমাদের সাথে বসে রেস দেখার আমন্ত্রণ জানাতে পারি আমরা ভদ্রলোককে।' ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি রজার সাইমুর। এ আমার বান্ধবী, মে হরোইৎজ। আর এ হচ্ছে রোজালিন সাইমুর, আমার ভাইঝি।'

লোকটার গাঢ় পাথুরে চোখে চোখ রেখে হাসল ও। একই সাথে গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল তার শীতল লাভা রঙের দু'চোখের স্থির চাউনি দেখে। 'আমি রানা। মাসুদ রানা।' জোরে ঝাঁকিয়ে দিল খুদে হাতটা। মেয়েদের সাথেও হাত মেলাল ও। এরমধ্যে নিজের রঙ ফিরে পেয়েছে রোজালিন, হাসছে বোকার মত। মে হরোইৎজকে দেখে যতটা মনে হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট মহিলা। হাসি উষ্ণ, মনকাড়া।

'বসছেন তো আমাদের সাথে রেস দেখতে?' বলল রজার।

'প্লীজ, বসুন!' অনুনয় করল কৃতজ্ঞ রোজালিন।

'ধন্যবাদ।' ঘুরে সোফার সামনে চলে এল রানা। সরে তার আর বিজ্ঞানীদের

মাঝখানে ওকে বসতে জায়গা করে দিল মেয়েটি। নিজের গ্লাসের সাহায্যে কোর্সে নজর বোলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ।

'আমার ঘোড়াও আছে আজকের রেসে,' বলল সে অন্যমনস্ক কণ্ঠে।

'তাই নাকি?' ঝুঁকে বসল রানা। 'কোনটা?'

'চায়না ব্লু,' গ্লাস নামিয়ে ওর দিকে তাকাল বিজ্ঞানী। শীতল লাভা জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন মুহূর্তের জন্যে। 'এবারের গোল্ড কাপ আমার ঘরেই যাবে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'কি আশ্চর্য!' মৃদু শব্দ করে হাসল ও। 'আমিও তো তাই চাইছি, কারণ আজকের বাজী চায়না ব্লুর ওপরেই ধরেছি আমি।'

'সত্যি!' সন্তুষ্টি ফুটল তার চেহারায়। 'তাহলে বলতে হয় আপনার টাকা নিরাপদ। রোজালিনের এতবড় উপকারের কিছুটা প্রতিদান দিতে পারব আমি। কি ভেবে ওটার ওপর বাজী ধরলেন?'

'নামটা পছন্দ হলো, তাই।'

'রেস শুরু হচ্ছে!' রোজালিনের রুদ্ধশ্বাস গলা শুনে ফিল্ড গ্লাস তুলল ও, নজর দিল আড়াই মাইলের অ্যাসকট গোল্ড কাপ রেসের স্টার্টিং পয়েন্টে। একই মুহূর্তে নিচের দর্শক গ্যালারি গর্জে উঠল—শুরু হয়ে গেছে রেস। ব্যস্ত হাতে কোনমতে ফোকাস রি-অ্যাডজাস্ট করার সময় পেল রানা, ততক্ষণে মেঘের মত ধুলো উড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুট লাগিয়েছে দশটা ঘোড়া।

আধ মাইলের মধ্যে দৌড়ের একটা প্যাটার্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগে আগে ছুটছে চারটা—রানীমার ঘোড়া, ফ্রান্সিস ফলি, ডেসমন্ড ডিলাইট ও সফট সেন্টার। প্রায় পাশাপাশি রয়েছে এরা। প্রথমটার গলা অল্প কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে রয়েছে। এরপর একসাথে তিনটে, প্রায় দশ ঘোড়া পিছনে পড়ে গেছে এরা। আর সব অনেক পিছনে। দ্বিতীয় গ্রুপের এপাশেরটা সাইমুরের চায়না ব্লু। হালকা হলুদ আর কুচকুচে কালো রঙ ওটার।

বক্সের ভেতর অদ্ভুত চাপা উত্তেজনা অনুভব করল মাসুদ রানা, কথা নেই কারও মুখে। সবাই শক্ত হয়ে বসে আছে। নজর চায়না ব্লুর ওপর স্থির। এর মধ্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে রানীমার ঘোড়া, কিন্তু ডেসমন্ড ডিলাইট ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়, সঙ্গের দুটোকে একটু একটু করে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল চার লীডার। প্রায় আধঘোড়া পরিমাণ পিছিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস ফলি ও সফট সেন্টার। পরের দুটো এমনভাবে ছুটছে, মনে হয় একটাই বুঝি। এক মাইল পেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে ওরা।

ওদিকে পরের তিনটের মধ্যে দুটো পিছিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। না, পিছিয়ে পড়া বলতে যা বোঝায় এ ক্ষেত্রে তা ঘটল না, ভুল দেখেছিল রানা। যা ঘটেছে, তা রেসের বেলায় যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অভাবিত। হঠাৎ করে অদৃশ্য কোন শক্তির প্রভাবে যেন গতি অস্বাভাবিক বেড়ে গেল চায়না ব্লুর। এর মধ্যেও খেয়াল করেছে ও, কি যেন বিড় বিড় করে বকছে বিজ্ঞানী। এবং ব্যাপারটা শুরু হতে না হতে ব্লুর গতি বাড়ার ঘটনাটা ঘটল। সঙ্গীদের পিছনে ফেলে প্রথম গ্রুপের পরের দুটোর সাথে নিজের ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে আনতে শুরু করেছে

ওটা।

'ব্লু! কাম অন, ব্লু!' চাপা কণ্ঠে বারবার একই কথা বলে চলেছে রোজালিন, বক্সের রেলিঙের বাইরে ঝুলছে তার অর্ধেক শরীর। মে হরোইৎজও দাঁড়িয়ে গেছে উত্তেজনায়, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ।

দর্শক গ্যালারি উত্তেজনায় টান্ টান। প্রথম চারটের ওপর নজর ছিল তাদের, জানা কথা ওদেরই একটা জিতবে। কিন্তু এক মাইল পেরিয়ে আসার পরপরই চায়না ব্লু যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিল, তাতে সবার বিস্ফারিত দৃষ্টি ওটার ওপর থেকে নড়ছেই না এখন। দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ অভাবনীয় ব্যাপারটা।

প্যাডকে মনের চোখে দেখা ব্লুর সাথে এ মুহূর্তে কোর্সে কেশর দুলিয়ে ঝড়ের বেগে ধাবমান ঘোড়াটাকে মেলাতে পারছে এখন রানা—অনুমানে ভুল হয়নি ওর। যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে দু'জোড়া পা উঠছে আর নামছে ওটার, এতই দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা দায়। মনে হচ্ছে এতক্ষণ মূল শক্তি রিজার্ভ রেখেছিল ব্লু, জকির নির্দেশে এবার ব্যবহার শুরু করেছে।

দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস ফলি ও সফট সেন্টারকে পিছে ফেলে ডেসমন্ড ডিলাইটকে ধাওয়া করল ওটা, রানীমার ঘোড়ার সাথে সমান সমান তখন ডিলাইট। শেষ চক্কর ঘুরল ব্লু প্রথম দুটোর সামান্য পিছনে থেকে—চমকের তখনও বাকি ছিল, এবার তা চাক্ষুস করল দর্শক। বাঁকটা ঘুরেই পেট প্রায় মাটির সাথে ঠেকিয়ে দৌড় শুরু করল ব্লু, একেক লাফে অন্যগুলো যতটা দূরত্ব পার হচ্ছে, ওটা তার কম করেও সিকি গুণ বেশি অতিক্রম করছে।

তুমুল হাততালি আর আকাশ ফাটানো হৈ-হৈর মধ্যে শেষ পাঁচশো গজের ভেতরে ডিলাইট ও রানীমার ঘোড়াকে প্রায় অনায়াসে পিছনে ফেলে দিল ওটা। মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল গ্যালারি, দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে উন্মত্তের মত চিৎকার শুরু করে দিল কয়েক হাজার দর্শক। চায়না ব্লু শেষ লাইন অতিক্রম করামাত্র ছাগলের বাচ্চার মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রজার সাইমুর, খুশির চেয়ে গর্ব আর অহঙ্কার বেশি ফুটেছে তার চেহারায়।

'ও পেরেছে!' প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল রোজালিন। 'ব্লু জিতেছে! আমাদের ব্লু জিতেছে।'

'ওয়েল, মিস্টার রানা,' বক্সের উত্তেজনা প্রশমিত হতে হাসল বিজ্ঞানী। 'কেমন লাগছে আপনার?'

'এইমাত্র আপনার চায়না ব্লু পনেরো হাজার পাউন্ড পাইয়ে দিল, কাজেই অনুমান করে নিন,' হেসে জবাব দিল ও।

ব্যস্ত হয়ে উঠল লেয়ার্ড অভ ম্লারকান্ডি। 'এবার যেতে হয়। যদি কখনও স্কটল্যান্ড আসেন, আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবেন, খুশি হব।' নিজের একটা কার্ড ধরিয়ে দিল সে ওর হাতে।

ওটা পড়ে আবার হাসল রানা। এবার চওড়া। 'আরেক দৈব-সংযোগ দেখছি! ইন ফ্যাক্ট ক'দিন পরই স্কটল্যান্ড যাওয়ার কথা আমার।'

শীতল চাউনি আরও শীতল হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'বেড়াতে, না কাজে? করেন

কি আপনি?'

'এক সময় সৈনিক ছিলাম। বর্তমানে মার্সেনারি।'

ভুরু তুলে ওকে দেখল সে। 'ওয়েল, ওয়েল! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল হাজির!'

'অর্থাৎ?' প্রশ্ন করল রানা।

'আগে বলুন ওখানে কেন যাচ্ছেন, কাজে?'

'মূলত বেড়াতে। তবে কাজ-টাজ যদি জুটে যায়...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। 'কি ধরনের কাজ?'

'আমার প্রফেশন তো শুনলেনই,' পকেট থেকে সিগারেট বের করল রানা। 'কন্ট্রাক্ট বিজনেস আর কি! অবশ্য যা দিনকাল পড়েছে, তাতে কাজ পাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছে আমাদের।'

ওর বাহু আঁকড়ে ধরে একপাশে টেনে নিয়ে এল বিজ্ঞানী। 'আপনি আমার ওখানে এলে আমি হয়তো এক-আধটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারব,' চাপা গলায় বলল। 'আমার অনেক বড় এস্টেট, প্রচুর কাজ ওখানে। আর...সেসব যদি পছন্দ না হয়, অন্য কাজও জোগাড় করে দিতে পারব। চলে আসুন।'

'আপনার এস্টেট!' চেহারায় বিস্ময় ফোটাল ও।

'আমার কার্ডটা পড়েননি বোধহয় ভাল করে,' অসন্তুষ্ট হলো যেন বৃদ্ধ। 'আমি লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি।'

'সরি!' অপ্রস্তুত চেহারা করে পকেট থেকে কার্ডটা বের করতে যাচ্ছিল রানা, বিজ্ঞানী বাধা দিল।

'থাক এখন, পরে দেখে নেবেন। আমাকে এখন যেতে হয়, চায়না ব্লুকে অভিনন্দন জানানো হয়নি, মন খারাপ করবে ওটা। আপাতত কিছুদিন ফ্রী আছি আমি, সময় নষ্ট না করে চলে আসুন। ওখানে ভালই লাগবে আপনার। আয়ও প্রচুর হবে, নিশ্চিত থাকুন।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আচ্ছা, বেশ।'

মেয়েদের দিকে ঘুরল রজার সাইমুর। 'চলো, যাওয়া যাক। মিস্টার রানা খুব শীঘ্রি আমাদের ক্যাসেলে আসছেন।' শেষ বাক্যটা প্রায় নির্দেশের মত ঠেকল রানার কানে।

মে হরোইৎজ কিছু বলল না, নীরবে হ্যান্ডশেক করে মনকাড়া এক চিলতে হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল কথাটা সত্যি হলে সে খুশি হবে। রোজালিন নেকলেস 'উদ্ধার' করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে রানাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওর পৌঁছার অপেক্ষায় থাকবে জানাল।

বিজ্ঞানী ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বক্স থেকে, স্বভাবসুলভ ব্যস্ত, ছোট ছোট পায়ে করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। আর একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি লোকটা।

রানাও বেরিয়ে এল বক্স থেকে। ফিল্ডগ্লাসের একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ বুড়ো আঙুলের ভাঁজে ধরে কার পার্কের দিকে এগোল। বের হওয়ার পথে বাজীর টাকা নিতে ভুলল না। আট পারসেন্ট বেটিঙ ট্যাক্স আর বুকমেকারের কমিশন শোধ

করে রসিদ নিল, তারপর লোকটাকে একটুকরো সবজান্তা মার্কা হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে এল।

চার

রজার সাইমুরকে বেশি একটা এগিয়ে থাকতে দেয়ার ইচ্ছে নেই রানার, ঠিক করেছে সে ক্যাসেলে ফিরে যাওয়ার পরপরই ওখানে হানা দেবে। তাই হোটেলে ফিরে গ্লাসগো সেন্ট্রাল হোটেলের রুম বুক করল ও ফোনে, জানিয়ে দিল কাল খুব ভোরে পৌঁছবে। পরের ফোনটা করল মারভিন লংফেলোর গোপন নম্বরে।

দিনের বাকি সময় সেঁটে ঘুম দিয়ে পার করল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লম্বা ড্রাইভে। পথে অসংখ্য বিষয়ের সাথে চায়না ব্লুকে নিয়েও মাথা ঘামাল ও। ঘোড়াটার অপ্রত্যাশিত জয়ের পিছনে মূল কারণটা কি, ভাবতে ভাবতে একটা অনুমান পছন্দ হলো। আগের রেসগুলোয় জকি নিশ্চই ওটার গতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল–জিততে দেয়নি। তার মানে ব্লুর গতি সম্পর্কে অন্যদের গোল্ড কাপের আগে পর্যন্ত কাউকে বুঝতে দিতে চায়নি রজার সাইমুর।

দেখা যাক, চিন্তার বিষয় বদলানোর আগে ভাবল রানা, এর আর কোন জবাব পাওয়া যায় কি না সাইমুর ক্যাসেলে।

সারারাত তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটাল ও অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপ চোখের সামনে রেখে। গ্লাসগো সেন্ট্রালে ভরপেট নাস্তা খেয়ে যখন কফির কাপে চুমুক দিল, রুমের ওয়াল ক্লক ন'টার সঙ্কেত দিল তখন। এরপর দরজার বাইরে 'ডু নট ডিসটার্ব' সাইন ঝুলিয়ে আরেক দফা লম্বা ঘুম দিল রানা। এক ঘুমে সন্ধে সাতটা বাজিয়ে উঠল। হোটেলের নামকরা ম্যালমাইসন রেস্টুরেন্টে সাপার সারল। স্কটল্যান্ডের সেরা ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্ট। কিন্তু রানা খেলো হালকা–স্মোকড স্যামন, গ্রীন স্যালাড আর কড়া কালো কফি। রাতে আবার পথে নামতে হবে, ভারী খাবার খেয়ে অস্বস্তিতে পড়তে চায় না।

সাড়ে দশটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও, এ-৮২ মোটরওয়ে ধরে উত্তরে ছুটল, উপকূল ঘেঁষা অজস্র লচ-এর উদ্দেশে। ভোরের একটু আগে লচ লোমন্ড হয়ে লচ গ্যারি পৌঁছল। দিনটা ওখানে কাটিয়ে রাতে আবার রওনা হলো এ-৮৭ ধরে, লচ ক্যারলের গভীর পাইন বনে পৌঁছল পরদিন ভোর সোয়া চারটায়। এখান থেকে মারকান্ডির সাইমুর ক্যাসেল কাছেই, মাত্র সত্তর মিনিটের ড্রাইভ। কিন্তু এখনই গিয়ে হাজির হতে চায় না রানা–আগে দূর থেকে ওটার ওপর রাতের আঁধারে নজর বোলানোর ইচ্ছে আছে।

বনের আরও গভীরে গাড়ি নিয়ে এল ও। বিএসএসের বিশেষ গাড়ি এটা–স্যাব ৯০০ টার্বো, বুলেট প্রুফ বডি, মহাশক্তিধর এঞ্জিন। চারদিক দেখে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে পার্ক করল রানা, সঙ্গে নিয়ে আসা হালকা নাস্তা আর বোতলের পানি খেয়ে সীট অ্যাডজাস্ট করে ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্য ডোবার একটু আগে উঠল ও। চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজে লেগে পড়ল। বুট খুলে ব্রীফকেসের ভেতর থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে কোটের সাইড পকেটে রাখল। ওর মধ্যে মাত্র ছয়টা সিগারেট আসল, বাকি সব অর্ধেক আসল। ফিল্টার টিপের ওপরের প্রায় ইঞ্চিখানেক জায়গায় তামাক নেই, ওর বদলে অনেক যত্নের সাথে ফিট্ করা আছে প্রি-সেট ইলেকট্রনিক মাইক্রোবাগ। দুর্গে কাজে লাগতে পারে। টেপ ও মাইক্রো হেডসেটসহ ওগুলোর মিনি রিসিভার শুয়ে আছে ব্রীফকেসের ফলস্ কম্পার্টমেন্টে।

ওয়ালথার আগের জায়গাতেই আছে, এখনই প্রয়োজন নেই ওটার। মারকান্ডি পৌঁছে প্রথমে ও যা করতে যাচ্ছে, সে-জন্যে চাই বাউচ অ্যান্ড লম্ব কোম্পানীর নতুন আবিষ্কার স্ট্র্যাপ-অন নাইটফাইন্ডার হেডসেট। ওটা পাশের সীটে রেখে স্টার্ট দিল রানা। সূর্য তখন সবে ডুব দিয়েছে। বন থেকে বেরিয়ে রওনা হলো ও। ঠিক সত্তর মিনিটের মাথায় মারকান্ডি ঢুকল ছোট এক কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে। এখান থেকেই গ্রাম শুরু।

একটাই মাত্র রাস্তা–চমৎকার মসৃণ, কালো কার্পেটিং করা। দু'পাশে পরিচ্ছন্ন কটেজের সারি। আর আছে দুটো জেনারেল স্টোর, একটা ইন ও একটা গির্জা। ছোট নদীর পারে, বড়সড় এক উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে মারকান্ডি। একেবারে শেষ মাথায় ছোট এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সাইমুর ক্যাসেল। খাড়া। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দূর থেকে ওটার টাওয়ারকে তর্জনীর মত লাগছে দেখতে। আঙুল তুলে শাসাচ্ছে যেন–অ্যাই, চুপ!

রাস্তায় মানুষজন একেবারেই নেই, বিরান। দুয়েকটা কটেজে আলো জ্বলছে। গির্জার ওপাশ থেকে V-র মত দুভাগ হয়ে গেছে রাস্তা, একটা গেছে সাইমুর ক্যাসেলে, অন্যটা তার সামান্য দূর দিয়ে শিলডিগ গ্রাম ঘুরে মোটরওয়ে এ ৮৯৬-এ গিয়ে মিশেছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা সাপের মত আঁকাবাঁকা, কালো রাস্তাটা। আরেক পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে ওটা, প্রায় ক্যাসেলের বাউন্ডারি ওয়াল সমান উঁচু দিয়ে।

ওটা ধরেই এগোল রানা। নির্জন জায়গায় এসে গাড়ি থামিয়ে মাথার ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপ গলিয়ে ইনফ্রা রেড নাইটফাইন্ডার জোড়া পরে নিল। দূরবীনেরই নতুন সংস্করণ জিনিসটা–দেখতে গগলসের মত। খাঁজকাটা পুরু প্লাস্টিক হোল্ডে ধরা দুই লেন্সের মাঝখানটা নাকের ওপর ঠিকমত বসিয়ে সামনে তাকাতেই দিনের মত পরিষ্কার দেখতে পেল ও সবকিছু। একেবারে ঝকঝকে।

হেডলাইট অফ করে এগোল এবার রানা। কোন প্রয়োজন নেই আলোর। প্রায় আধমাইল পেরিয়ে এসে দুর্গের পাশাপাশি এক জায়গায় থামল বড় এক ঝোপের আড়ালে। এখান থেকে নজর বোলাতে সুবিধে হবে। মনের মধ্যে খুঁত-খুঁত করছে। গ্রামের কেউ দেখেনি ওকে, তবু কেন যেন মনে হচ্ছে খবরটা গোপন নেই। কেউ না কেউ জেনে গেছে, হয়তো রজারের কানে পৌঁছেও গেছে এতক্ষণে সে খবর।

ভাবটাকে পাত্তা দিল না। গুরুত্ব দিলে এসব পেয়ে বসে। বেরিয়ে পড়ল ও গাড়ি থেকে। আড়মোড়া ভেঙে দুর্গের দিকে তাকাল। কম করেও এক মাইল দূরে

বিশাল এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। নাইটফাইন্ডারের পাল্লা পাঁচশো গজ, কাজেই ফিল্ডগ্লাসও প্রয়োজন হলো–ডবল লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাল ও, এক লাফে সামনে চলে এল দুর্গ।

গ্র্যানিট পাথরের পুরু দেয়াল দিয়ে চারদিক ঘেরা ওটা। বয়সের ভারে কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে দেয়াল, পরে আবার ইঁট দিয়ে মেরামত করা হয়েছে জায়গাগুলো। দুর্গের সামনের দিকে রানার বাঁয়ে, দেয়ালের চওড়া এক ফাঁকের সাথে মিশেছে এসে গ্রামের রাস্তা। পুরু স্টীলের রডের মজবুত গেট ওখানে–সম্ভবত বিদ্যুৎচালিত। ওটাই ভেতরে যাওয়া-আসার একমাত্র পথ।

দুর্গও মেরামত করা হয়েছে অনেক জায়গায়, তবে বাইরের চেহারা একই আছে মনে হলো রানার। বিশাল গথিক কাঠামো। সামনের পিলারওয়ালা বড় পোর্টিকোয় বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের চারদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল বাগান। ভালই, ভাবল ও, রজার সাইমুর রাজার হালে আছে। দুর্গের পিছনদিকে, বেশ দূরে এক জায়গায় বড় এক পাথর আর পুরানো কাঠের স্তূপ দেখা গেল।

খুব সম্ভব দুর্গের অংশ, ভাবল রানা, রিকন্সট্রাকশনের সময় জমা করা হয়েছে। তার মানে কি বেশিদিন হয়নি কাজটা করিয়েছে বিজ্ঞানী? ভারী ড্রেপারের ওপাশে প্রায় প্রতিটি রুমে আলো জ্বলছে দুর্গে, কিন্তু মানুষজনের দেখা নেই। আর দেরি করা উচিত হবে না ভাবল রানা, এবার ফেরা দরকার। ফিল্ডগ্লাস নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এল ওরা।

অভিজ্ঞ, পেশাদার শিকারীর নিঃশব্দ পদক্ষেপে–মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা নিশি প্রেতাত্মার মত। কিন্তু আসলে প্রেতাত্মা নয়। রানার চেয়ে কম করেও এক হাত লম্বা হবে দলের নেতা, পাশে প্রায় দ্বিগুণ। তার দু'পাশে আরও দুই দানব, তবে এ দুটো চওড়ায় যা, লম্বা তত নয়। একজনের গালে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

'সাইমুর ক্যাসেলের ওপর স্পাইং হচ্ছে?' কড়া স্কটিশ অ্যাকসেন্টে ঘেউ ঘেউ করে উঠল দানব।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' লোকটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল ও। 'ভুল বুঝেছ তুমি। আমি…' নাইটফাইন্ডার খোলার জন্যে হাত তুলেছিল, কিন্তু কাজ শুরুই করতে পারল না, দুই শক্তিশালী হাতে কোটের ল্যাপেল ধরে রানাকে শূন্যে তুলে ফেলল নেতা।

'পরে শুনব তোমার কথা। এখন চুপচাপ আমাদের সাথে এসো, কেমন?'

মেজাজ বিগড়ে গেল ওর, ঠিক এক ফুট সামনে ব্যাটার নাকটা চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করছে দেখে কপাল দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল গায়ের জোরে। গুঙিয়ে উঠল দানব, ওকে ছেড়ে নিজের নাক চেপে ধরে এক পা পিছিয়ে গেল। দু'চোখ জ্বলছে ভয়ঙ্কর রাগে। লোকটার আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্তের ধারা নামতে দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা।

'আজ তোমার একদিন কি…' কাছেই নারীকণ্ঠের ডাক শুনে থেমে গেল দানব।

'পিটার! কোথায় তোমরা? কে ওখানে?'

শোনামাত্র মে হরোইৎজের গলা চিনতে পারল রানা। 'আমি রানা, মিস মে,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'অ্যাসকটে পরিচয় হয়েছিল আমাদের।'

প্রথম তিনজনের মতই মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো মেয়েটি, দ্রুত ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। 'মাই গড! এ যে সত্যি···এখানে কি করছেন আপনি, মিস্টার রানা?' বলে পিটারের দিকে তাকাল। 'কি হয়েছে তোমার?'

'এই লোক নাকে মেরেছে, মাথা দিয়ে,' রুমাল দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বলল দানব। মুহূর্তে চেহারা পাল্টে গেল ওটার।

শব্দ করে হাসল মে। 'এই লোক, তোমাকে মেরেছে! বলো কি?'

'এ বোধহয় পোচার ভেবেছিল আমাকে,' রানা বলল। 'কলার ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিয়েছিল। সরি। ভুলে ট্রেসপাস করে বসিনি তো?'

'না,' মাথা দোলাল সে হাসিমুখে তা করেননি। এটা সরকারী জায়গা।' ওর দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। নাকে ম্যাডাম রোচাসের মিষ্টি সুবাস পেল রানা। 'আমরা এসেছি শিকার করতে। কিন্তু আপনি···এখানে কেন?'

'পথ হারিয়ে ফেলেছি,' সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল ও। এমন সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাইটফাইন্ডার জোড়া খুলল, যেন ওটা খুব সাধারণ কিছু, সবাই ব্যবহার করে। 'ক্যাসেলটা কোথায়, খুঁজছিলাম।'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল মে, যেন ও যে সত্যি বলছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 'পেয়ে গেছেন নিশ্চই?'

'হ্যাঁ।'

ওর কাঁধে এক হাত রাখল সে। 'এবার ভেতরে যাবেন আশা করি? আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা।'

'অবশ্যই যাব। সেই জন্যেই তো এলাম।'

'চলুন তাহলে,'-বলে পিটারের দিকে তাকাল মে। 'আমি মিস্টার রানাকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা গাড়ি নিয়ে এসো। আজ আর শিকার করব না।' কথার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে নাইটফাইন্ডারটা নিয়ে লোকটার হাতে তুলে দিল সে, রানা দেখেও না দেখার ভান করল।

কারে উঠে বসল রানা তাকে নিয়ে, ঘুরে গ্রামের পথে ফিরে চলল। 'সোজা যেতে থাকুন,' বলল মেয়েটি। 'গ্রামে পৌঁছে পথ দেখাব আমি।'

মাথা দুলিয়ে সামনে মন দিল ও। দু'মিনিট পর রিয়ার ভিউ মিররে একজোড়া আলো দেখা গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে। পিটার আসছে নিশ্চই। দুর্গের মেইন গেটে পৌঁছতে সংলগ্ন গার্ড হাউস থেকে এক গার্ড বেরিয়ে এসে খুলে দিল গেট। আগে কারের আরোহীদের দেখে নিতে ভুল হয়নি তার।

'এমনিতে ম্যানুয়ালি অপারেট করা হয় গেটটা,' যেন কথার কথা, এমন ভাবে বলল মে হরোইৎজ। 'তবে রাতে দুর্গের সবাই ফিরে এলে স্পেশাল লকিং সিস্টেম চালু করে দেয়া হয়। ইলেক্ট্রিক্যাল।'

এক আধটা মন্তব্য করা উচিত, তাই বলল রানা, 'আই সী!'

'বলা তো যায় না, কখন কোন বিপদ-আপদ ঘটে যায়! দুনিয়ার কোথাও এখন আর শান্তিতে থাকার উপায় নেই। আপনি আসায় খুব ভাল হলো, মিস্টার

রানা। নাকি মাসুদ বলে ডাকব?'

'রানা, প্লীজ!'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'যা বলছিলাম। এখানে তেমন গেস্ট আসে না। আপনি এসেছেন বলে খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে ক্যাসেলের পিলারড্ পোর্চের নিচে এসে থামল রানা। প্রায় একই সাথে পাঁচ ফুট পিছনে ব্রেক কষল একটা ল্যান্ডরোভার, ভেতর থেকে নামল পিটার ও তার দুই সঙ্গী। এরমধ্যে ওদের নাম জানা হয়ে গেছে রানার, ফ্রেঞ্চ কাটের নাম নিক, অন্যটার ফ্রেড।

গাড়ি থেকে নেমে নিককে ডাকল মে হরোইৎজ। 'তুমি লেয়ার্ডকে খবর দাও। বলবে মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন।' রানার দিকে ফিরল। 'গাড়ির চাবি পিটারকে দিন, ও আপনার লাগেজ পৌঁছে দেবে ভেতরে।'

মাথা দোলাল রানা। মের বেখেয়ালের সুযোগ নিয়ে গাড়ি লক্ করে দিয়েছে এর মধ্যে। 'এখন থাক ওসব। পরে হবে।'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'বেশ।'

চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে দুর্গের মূল দরজার দিকে ঘুরে তাকাল রানা। ভূচর পাখি রজার সাইমুর এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। রানাকে দেখামাত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার, তিড়িং বিড়িং করে প্রায় ছুটে এল। 'আরে, মিস্টার রানা যে! সত্যি এসেছেন তাহলে?' বলতে বলতে দানবের ওপর চোখ পড়ল তার। আঁতকে উঠল। 'গুড হেভেনস্। তোমার আবার কি হলো, পিটার?'

'আমারই ভুল,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা। 'বুঝতে না পেরে মেরে বসেছি। দুঃখিত, পিটার।'

ওর দিকে তাকালই না দানব। তখনও রক্ত মুছছে ভেজা রুমাল দিয়ে। মনিবের চোখে চোখ রেখে সমীহের সাথে বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি ইনি আপনার গেস্ট, লেয়ার্ড। স্পাই বা পোচার হবে ভেবেছিলাম অদ্ভুত আচরণ করতে দেখে।'

'অ। ঠিক আছে, পরে শুনব। মিস্টার রানা, ওকে গাড়ির চাবি দিন, মালপত্র নিয়ে আসুক আপনার।'

এবারও ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল ও। খেয়াল করে হাসল বিজ্ঞানী। 'ঠিক আছে, থাকুক এখন। পরে হবে ওসব। চলুন।'

লোকটার সাথে দুর্গে ঢুকল রানা। মে আগে আগে হাঁটছে। 'ওর গায়ে হাত তোলা ঠিক হয়নি আপনার,' যেন নিজের সাথে আলাপ করছে, এমনভাবে বলল বৃদ্ধ। 'ও বড় ভয়ঙ্কর। সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে।'

পাঁচ

ভেতরের সাজ-সজ্জা যে কোন আগন্তুকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়ার মত। সম্পূর্ণ অন্য জগৎ যেন এটা, ভিক্টোরিয়ান গথিক নয়–একেবারে অত্যাধুনিক। বিশাল হলরুম, দামী কাঠের সার্কুলার সিঁড়ি আর সংলগ্ন গ্যালারি, সবকিছু ধপধপে সাদা, ভেতরের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে গা থেকে। বিশাল দরজাগুলোর রঙ কালো। মেঝেতে পুরু সাদা কার্পেট। হাঁটতে গিয়ে রানার মনে হলো নরম লন ধরে চলেছে ও।

চার দেয়ালের নিচের অংশে ছাড়া-ছাড়া ঝোলানো আছে পঞ্চ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বেশ কিছু সমরাস্ত্র–যুদ্ধ কুঠার, রনচা, ব্যাট'স উইঙ করসিকুয়েস, ওঅর ফর্কসহ শত্রুকে বিদ্ধ করার আরও অনেক শানিত, ভয়ঙ্কর অস্ত্র। আলোয় চক চক্ করছে সব।

পাখির ডানা মেলার মত চকিতে দু'হাত প্রসারিত করল রজার। 'আগেকার আমলের যুদ্ধের র মেটেরিয়াল, আমি সংগ্রহ করি এসব। হবি। অবশ্য ভালগুলো এখানে রাখিনি। রেখেছি অন্য জায়গায়।'

হলের মাঝখানে রাখা একটা সোনালী ধাতব টেবিল ইঙ্গিত করল সে। ওটার ওপর কাঁচের বাক্সে একটা খোলা পিস্তল বক্স দেখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বক্সের ভেতর একজোড়া ডুয়েলিঙ পিস্তল শুয়ে আছে। আটকোনা ব্যারেল।

গর্বের হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'আঠারোশো তেতাল্লিশের শেষ ইংলিশ ডুয়েলে মনরো আর ফসেট ব্যবহার করেছিল এ দুটো।' রানার ডানদিকটা দেখাল। 'মনরোর। ফসেটের মৃত্যুদূত।'

পিছিয়ে এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা, দেয়ালের ওপরের অংশে নিয়মিত দূরত্বে ঝোলানো পেইন্টিঙগুলো দেখল।

'হ্যাঁ, পেইন্টিঙ সংগ্রহেরও শখ আছে আমার,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল লেয়ার্ড। 'ওটা পিকাসোর "ব্লু পিরিয়ড," আর ওটা মাতিসের "পিঙ্ক ন্যুড"।'

'অরিজিন্যাল?'

'অবশ্যই অরিজিন্যাল!' পাখি-নড করল সে। 'চলুন, গলা ভেজানো যাক্।' ওপরদিকে মুখ করে মের নাম ধরে হাঁক ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো মেয়েটি, যেন ডাকের জন্যে আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছিল। এ মুহূর্তে অবশ্য অন্য ড্রেসে দেখল তাকে রানা।

'শিকারের পোশাক ছাড়তে গিয়েছিলাম,' মৃদু হেসে কৈফিয়তের সুরে বলল মেয়েটি। নেমে এল রাজকীয় চালে। 'আপনাকে আলোয় দেখে খুশি হলাম, মিস্টার রানা। অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পাইনি তখন। আসুন, রোজালিনকেও খবর দিয়েছি, এখনই এসে পড়বে।'

'আমাকে মাফ করতে হবে,' রজার বলল। 'মেয়েদের সাথে গল্প করুন,

মিস্টার রানা। আমি দেখি পিটারের কি অবস্থা।'

ও কিছু বলার সময় পেল না, বাহু ধরে আলতো করে টান দিল মে। 'আসুন, ড্রইং রুমে গিয়ে বসি।'

ওরা পা বাড়াবার আগেই নেমে এল রোজালিন। রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল। 'মিস্টার রানা। হাউ নাইস অভ উই।'

সাদা সান্ধ্য ড্রেসে মেয়েটিকে অপ্সরীর মত লাগছে। ওর দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। ওপরের গ্যালারিতে কারও মাথা আর পিঠের এদিকটা দেখতে পেল পলকের দশভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে, খুব দ্রুত একটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল লোকটা। চোখ কুঁচকে উঠল ওর–আরগুয়েলো! এখনও যায়নি সে?

'কি হলো, কি দেখছেন অমন করে?' প্রশ্ন করল মে।

'মনে হয় বেড়াল,' আনমনে বলল ও।

'ও, তা হবে। আসুন।'

যে রুমে ওকে নিয়ে আসা হলো, সেটাও বেশ লম্বা-চওড়া। অরনেটের উঁচু সিলিঙ। দেয়ালের রঙ শেল পিঙ্ক। রুমের ফার্নিচার সব চামড়া মোড়া পুরু গদির। দরজা-সোজা উল্টোদিকের দেয়ালের প্রায় পুরোটাই বিশাল এক পিকচার উইন্ডো। ঝলমলে আলোয় কাঁচের টিন্ট চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসের দেয়ালে আছে এই বিশেষ কাঁচ, তবে ওটার মত সবুজ ভাব নেই এটায়, আছে হালকা গোলাপী রঙের আভাস। এই জানালা দিয়ে বাইরের সব পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের আলোর আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। তাও আবছা। বুলেটপ্রুফ কাঁচ।

'কি দেব আপনাকে, মিস্টার রানা?' বলল মে।

'শ্যাম্পেন, সামান্য। অথবা ভদকা মার্টিনি।' রোজালিনের মুখোমুখি একটা সোফায় বসল ও। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল লেয়ার্ড। ডানহাত দেহের পিছনে, রাগ রাগ চেহারা।

'পিটারকে খানিক মশলা দিয়ে এলাম, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'সরকারী জমিতে কেউ পোচিঙ করুক চাই স্প্যাইঙ, তাতে ওর কি? ও কেন দুর্ব্যবহার করবে তার সাথে?' তার চোখের তারায় বিপজ্জনক, শীতল লাভার নড়াচড়া দেখতে পেল রানা।

ডান হাতটা সামনে নিয়ে এল সে, মুঠোয় ধরা রানার নাইটফাইন্ডার। 'এটা আপনার?' প্রশ্নের সাথে পাখি-নড করল। 'চমৎকার খেলনা!'

'পেশার খাতিরে এসব রাখতে হয়,' বলল ও। 'আপনার আমন্ত্রণে আমি এসেছি ঠিকই, তবে নতুন কোথাও, বিশেষ করে এরকম জায়গায় ঢোকার আগে আমার ট্রেনিঙ...'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' কয়েক পা এগিয়ে এল লেয়ার্ড। 'কৈফিয়ত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার কাজের স্টাইল আমার পছন্দ হয়েছে।'

রোজালিন ঝুঁকে বসল। 'কি ওটা?'

'নাইটফাইন্ডার বলে জিনিসটাকে,' মের হাত থেকে পানীয়ের গ্লাস নিয়ে বলল

ও। 'রাতে গাড়ি ড্রাইভ করার বেলায় খুব কাজে লাগে।'

'মিস্টার রানা,' বলল বিজ্ঞানী। 'গাড়ির চাবিটা দিলে লাগেজ আপনার রুমে পৌঁছে দিতে পারে পিটার।'

ধারণাটা পছন্দ নয় ওর, লোকটাকে ওর অনুপস্থিতিতে গাড়িতে হাতড়াহাতড়ি করার সুযোগ দিতে চায় না। কিন্তু এখন না দিয়েও উপায় নেই। এমনিতেই বেকায়দা অবস্থায় ধরা পড়ে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি করে বসেছে ও এদের মনে, তার ওপর বারবার চাবি দেয়ার বিষয়টা এড়িয়ে গেলে তা আরও বাড়বে। কিন্তু রানা চায় উল্টোটা–রজার সাইমুরের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। পকেটে হাত ভরে ওটা বের করল রানা, তুলে দিল তার হাতে।

প্রায় একই মুহূর্তে রুমে ঢুকল ট্রেইল কোট পরা আরেক প্রকাণ্ডদেহী। ভাব-ভঙ্গিতে তাকে বাটলার মনে হলো রানার। চাবিটা তাকে দিয়ে রজার বলল, 'পিটারকে বলো, মিস্টার রানার লাগেজ ইস্ট গেস্ট রুমে রেখে গাড়ি পার্ক করতে।'

কোন কথা না বলে চলে গেল লোকটা। ওর দিকে অমায়িক হাসি দিল বিজ্ঞানী। হাতের গ্লাস ইঙ্গিত করল। 'পান করুন। ডিনারের সময় হয়ে গেছে।'

চুমুক দিল রানা। ভাবছে অন্য কিছু। বৃদ্ধ আসার আগে পর্যন্ত বেশ সাবলীল ছিল রোজালিনের আচরণ, এখন কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। কথা প্রায় বলছেই না। কেন! পনেরো মিনিট পর বাটলার এসে রানার চাবি তুলে দিল মনিবের হাতে। জানাল, তার নির্দেশ পালন করা হয়েছে। গোছা হাতে পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো রানা। যদিও জানে না, আর কোন নির্দেশ ছিল কি না পিটারের ওপর। থাকলেও এখন তা জানার উপায় নেই, কাজেই চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল।

একটু পর আবার এল বাটলার, ঘোষণা করল ডিনার রেডি। 'চলুন,' উঠে পড়ল মে হরোইৎজ।

হলরুমে বেরিয়ে এল ওরা। উল্টোদিকের ডাইনিং রুমে ঢুকল এসে। এটাও যথেষ্ট বড়, দেয়ালে হালকা রঙ। আট চেয়ারের লম্বা মেহগনি টেবিলে সাজানো রয়েছে ডিনারের প্রথম কোর্স। চামচ-কাঁটা সব রূপোর–জর্জিয়ান। টেবিলের প্রত্যেকটা জিনিসে দুটো করে সোনার চাকতি আঁকা। লেয়ার্ড অভ মারকন্ডির প্রতীক।

লবস্টার ককটেইল, চিকেন বেজড কনজোমি, বীফ রিব, বিখ্যাত স্কটিশ পুডিঙ, ক্রীম ক্রাউডি ও পনিরের রাজকীয় ডিনার খেলো রানা তৃপ্তির সঙ্গে। লেয়ার্ডের কুকের চমৎকার রান্নার প্রশংসা না করে পারল না। 'এ আর কি!' প্রশংসা মাথা পেতে নিয়ে বিনয়ের সাথে বলল বিজ্ঞানী। 'আপনি আজই পৌঁছবেন জানলে আয়োজন ভিন্ন হত। যা খেলেন, খুবই সাধারণ। ক'দিন থাকুন, তাহলে বুঝবেন আমার কুক কি জিনিস।'

মেয়েরা উঠে গেল। সিগার, কাটার, দেশলাই–সাজিয়ে আনা হলো একটা রূপার পাত্রে। কাটারও রূপোর। ওগুলো রেখে দুই পেশীবহুল সার্ভেন্টকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাটলার। চুরুট নিল না রানা, লেয়ার্ডের অনুমতি নিয়ে সিগারেট

ধরাল।

'আমার প্রস্তাব তাহলে গ্রহণ করেছেন আপনি, মিস্টার রানা?' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল সে।

'হ্যাঁ, প্রথমটা।'

চোখ কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। 'অর্থাৎ?'

'বেড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছি আমি,' হাসল রানা দুই টুকরো শীতল লাভার দিকে তাকিয়ে।

লেয়ার্ড হাসল শব্দ করে। 'আমি বোঝাতে চেয়েছি পরেরটা। কাজের কথা। আমি মানুষ চিনি, রানা। গন্ধ শুঁকে বলতে পারি কে কাজের মানুষ। প্রথম দেখার সময়ই আপনার মধ্যে কাজের মানুষের গন্ধ পেয়েছি আমি। ঠিক বলিনি?'

শ্রাগ করল ও। বেশি গরজ দেখাবার ইচ্ছে নেই।

'আপনি নিশ্চই নিজের ক্ষেত্রে ওস্তাদ। সতর্ক। এ ধরনের মার্সেনারির মৃত্যু সহজে আসে না। দুর্গে ঢোকার আগে আপনার দূর থেকে স্পাইং করার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি চাইলে আপনার উপযুক্ত একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারব আমি। দু'একদিন থাকুন, দেখুন।'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মাসুদ রানা, তারপর সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কাজটা কিভাবে সম্ভব হলো?'

ভুরু কুঁচকে উঠল বিজ্ঞানীর। 'কোন্‌টা?'

'গোল্ড কাপ রেসের কথা বলছি,' একঘেয়ে সুরে বলল ও। হাসি অনুপস্থিত চেহারায়। 'চায়না ব্লু জিতল কি করে?'

বিস্ময় ফুটল বৃদ্ধের চোখে-মুখে। 'কি করে আবার! ভাল ট্রেইনার আর ভাল ঘোড়া ছিল বলে!'

'নতুন ট্রেইনার?'

ফাঁদটা টের পেল না লেয়ার্ড। দ্রুত মাথা দোলাল। 'নাহ্!'

'ট্রেইনার পুরনো, ঘোড়াটাও রেসে অভিজ্ঞ, তবু আগের কোন রেসে জয়ের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি চায়না ব্লু। কেন? গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনি জকিকে?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল লোকটা, চেহারায় অবিশ্বাস। হয়তো অস্বীকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে মত পাল্টাল কি ভেবে। চট্ করে উঠে পড়ল। 'আসুন। একটা জিনিস দেখাই।'

ডাইনিং রুমের শেষ মাথার এক বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, পকেট থেকে বড় এক গোছা চাবি বের করে খুলল ওটা। পিছনে দাঁড়ানো রানার দিকে ফিরে পাখি-নড করল। 'আসুন।'

ভেতরের আলোকিত, দীর্ঘ এক প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আরেক বন্ধ দরজার সামনে থামল বিজ্ঞানী। এটাও চাবি দিয়ে খুলল। এক মুহূর্ত পর বাস্কেটবল কোর্টের মত বড় এক রুমে ঢুকল রানা বিজ্ঞানীর পিছন পিছন। দুই দেয়ালে সিলিঙ সমান উঁচু র‍্যাকে ঠাসা দামী দামী বই। ঘরের মাঝখানে বড় এক মিলিটারি ডেস্ক, তার পিছনে গ্লাস কেবিনেট। বেশ কিছু অ্যান্টিক অস্ত্রশস্ত্র সাজানো আছে

ওর মধ্যে।

'আমার আপন ভুবন,' বলে ওর দিকে ফিরে হাসল বৃদ্ধ। 'সবাই এখানে আসতে পারে না। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে বলে এই দুর্লভ সম্মান দেয়া হলো।' ডেস্কের পিছনে বসে উল্টোদিকে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করে ডানদিকের ওপরের ড্রয়ার খুলল সে। ভেতরের এক ফোল্ডার থেকে দুটো ছবি বের করে ওর সামনে রাখল। দেখুন।'

দেখল রানা। দুটোই চায়না ব্লুর ছবি। বৃদ্ধ কি বোঝাতে চাইছে ধরতে না পেরে মুখ তুলল।

'কিছু বোঝেননি?'

মাথা দোলাল ও। 'ওয়েল, এই হচ্ছে আমার সিক্রেট। ওরা হচ্ছে দুই ভাই–যমজ। দেখতে অবিকল এক, দুটোকে একসঙ্গে না দেখলে কোন এক্সপার্টের সাধ্য নেই অন্য কিছু চিন্তা করার।' শ্রাগ করল সে। 'আমি একটা রেজিস্ট্রি করিয়েছি রেসের জন্যে, অন্যটার খবর কেউ জানে না। যমজদের ক্ষেত্রে একটা হয় দুর্বল, অন্যটা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী। আগের সব রেসে দুর্বলটাকে নামিয়েছি আমি।'

'গোল্ড কাপে নামিয়েছেন সবলটাকে?' লোকটার প্রতারণার কৌশল জেনে অবাক হলেও প্রকাশ করল না রানা।

'হ্যাঁ।' একটা ছবিতে টোকা দিল সে। 'এটাকে দেখেছেন আপনি রেসে। এটার স্ট্যামিনা অফুরন্ত, আর গতি তো নিজের চোখেই দেখলেন। যাক্, নিজের এই গোপন তথ্যটা আপনাকে কেন জানিয়েছি বুঝতে পারছেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'বোধহয়।'

'হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই আমি, তাই জানিয়েছি। যদি কখনও এ তথ্য ফাঁস হয়, কেউ আপনার মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না।'

'আমার মুখ থেকে ফাঁস হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল ও। লেয়ার্ড ছবি দুটো নিয়ে ফোল্ডারে ভরছে দেখে খুব দ্রুত হাত চালাল। একটা মাইক্রোবাগের অ্যাডহেসিভ লাগানো দিক টিপে লাগিয়ে দিল ডেস্কের তলায়, আরেক হাতে অকেজো সিগারেটটা কোটের সাইড পকেটে চালান করে দিল।

ড্রয়ারে তালা লাগিয়ে উঠল রজার সাইমুর। 'চলুন, রাত হয়েছে। বিশ্রাম দরকার আপনার।'

তাকে অনুসরণ করে হলরুমে এল রানা। মনের মধ্যে আরগুয়েলোর চিন্তা। কোথায় আছে লোকটা? কি করছে এখন ক্যাসেলে? হলরুমে মে আর রোজালিনের কাছ থেকে রাতের মত বিদায় নিল রানা। ঘুরে দাঁড়াবার আগে পরেরজনের উষ্ণ, বন্ধুসুলভ চাউনির মধ্যে কি যেন এক গোপন বার্তা আছে মনে হলো। কিছু যেন বলতে চাইছে। কি হতে পারে? নাকি ভুল দেখেছে ও? বিষয়টা নাড়াচাড়া করতে করতে বাটলারের পিছন পিছন নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। মনে মনে ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাইছে রিসিভারের কাছে।

সাইমুরের আপন ভুবনে আর কোন মীটিঙ বসে কি না জানতে হবে।

দুর্গের পুব প্রান্তের একটা বন্ধ দরজা মেলে ধরল বটিলার। গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'ইস্ট গেস্ট রুম, স্যার।'

'ধন্যবাদ।'

'লাগেজের চাবি দেননি আপনি, স্যার,' বলল সে। 'দিলে কাপড়-চোপড় সব প্রেস করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে পারতাম।'

ঘুরে একটুরো হাসি উপহার দিল রানা। 'সরি, ভুল হয়ে গেছে। গুড নাইট···ইয়ে···'

'হ্যারি, স্যার।'

'গুড নাইট, হ্যারি।'

'গুড নাইট, স্যার।'

বেরিয়ে গেল লোকটা, গভীর 'ক্লিক্' শব্দে দরজা লেগে গেল। চোখ কুঁচকে উঠল রানার। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে হাতল ধরে ওটা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। দরজা অনড়। আপাতত ও বন্দী, বুঝল রানা। নিশ্চই রিমোট্ কন্ট্রোল লকিং সিস্টেমের কাজ। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর ফিরে এল লাগেজের কাছে। দরজা নিয়ে ভাববার সময় নেই এখন।

রুমটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল দ্রুত। এটাও বেশ বড়, চারদেয়ালের রঙ কালো। সিলিঙে এখানে ওখানে জ্বলছে কনসিল্ড্ বাতি–মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট, কালো। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক খাট। বেডশীট ও পিলো কভার ধপধপে সাদা সিল্কের। দু'মাথায় চকচকে স্টীলের সেমি সার্কুলার প্যানেল। মৃদু আলো জ্বলছে তার মধ্যে। পায়ের প্যানেলের সাথে একদিকে সেট করা আছে কালার টিভি, অন্যদিকে স্টেরিও সিস্টেম।

মাথার কাছে বড় এক কনসোল। বেশ কয়েকটা সুইচ ওখানে। বোঝা গেল ওগুলো টিপে খাট ইচ্ছেমত ঘোরানো বা উঁচু-নিচু করান যায়। ব্রীফকেস নিয়ে বিছানায় বসল রানা। শার্ট-প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার–মোজাসহ অন্য সব বের করে খুব দ্রুত সাজিয়ে রাখল বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়ানো লম্বা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। কোট-টাই ইত্যাদি রাখল ওটার পাশের ক্লজিটে।

এরপর কেসের ফলস্ বটম থেকে বের করল খুদে এক রিসিভার/রেকর্ডার–এসটিআর ৪৪০, জিনিসটা লম্বায় ৮৪ ও পাশে ৫৫ মিলিমিটার মাত্র। ভেতরে সেট করা আছে পিচ্চি ক্যাসেট। সেটের সাথে একটা ফোম প্যাডেড মাইক্রো হেডসেটও আছে। বালিশের পাশে রেখে রিসিভার/রেকর্ডারের সুইচ অন করল রানা, পিনের মাথার মত ছোট্ট একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। লেয়ার্ডের ভুবনে পেতে রাখা বাগ অ্যাকটিভেট হয়েছে। মেশিন রেডি, ওখানে এখন সামান্যতম শব্দ হলেও রেকর্ড করে নেবে, একইসাথে রানাও হেডসেটের সাহায্যে শুনতে পাবে সব।

ড্রেস পান্টে রাতের পোশাক পরে বিছানায় বসল ও, কানে হেডসেট লাগিয়ে সিগারেট ধরাল–এবার অপেক্ষার পালা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটা চাপা কাশির শব্দ কানে এল। কেউ ঢুকেছে লেয়ার্ডের স্টাডিতে। পরমুহূর্তে

লেয়ার্ডকে বলতে শুনল, 'এসো। দরজা লাগিয়ে দাও।'

দরজার বোল্ট লাগানো, একটুপর চেয়ারের নড়াচড়ার আওয়াজ হলো, তারপর আবার বলে উঠল সে, 'ডিনারের ব্যাপারে দুঃখিত। আগন্তুকের সামনে তোমার যাওয়া ঠিক হবে বলে মনে হয়নি আমার। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'না। কিন্তু লোকটা কে?' কড়া স্প্যানিশ অ্যাকসেন্টে বলল আরেকজন। মাথা দোলাল রানা আপনমনে।

'তেমন কেউ নয়,' বলল বিজ্ঞানী। 'তবে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। পিটারকে তো দেখছ, মগজ বলে কিছু নেই। ভাবছি আস্তে আস্তে একে ওর জায়গায় বসানো যায় কি না পরীক্ষা করে দেখব।'

'করে কি···?'

'মার্সেনারি। অ্যাসকটে হঠাৎ···'

'পরিচয় চেক করে শিওর হয়েছেন?'

'হয়ে নেব। লোকটার নাম, গাড়ির নাম্বার, অন্য সব ডিটেইল্স্ জানা হয়ে গেছে। ওসবের সূত্র ধরে আর সব তথ্যও জেনে যাব কালকের মধ্যে।'

হাসল রানা। কেউ যদি ওর পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কার রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির সূত্র ধরে এগোবার চেষ্টা করে, যা জানবে, তার সাথে নাম ছাড়া অন্য কিছুর মিল পাবে না। মারভিন লংফেলো রানার কাভার ডোশিয়ে সাজিয়েছেন এভাবে–মাসুদ রানা, বাংলাদেশ আর্মির এক্স মেজর, রিটায়ার্ড। বর্তমানে মার্সেনারি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইত্যাদি ইত্যাদি।

লেয়ার্ড কথা বলছে তখনও। '···নিশ্চই! টেস্ট করব আমি লোকটাকে। পুরো নিশ্চিত হলে তবেই কাজের প্রস্তাব দেব। সে যাক্, তুমি তো কাল যাচ্ছ, যা যা বলেছি সব মনে আছে তো?'

'আছে, ওয়ারলক।' ওয়ারলক! ভাবল রানা, এ আবার কি ধরনের নাম? 'ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জার্মানিতে আমার টীম রেডি, কোন সমস্যা নেই। লাইনে আছে ওরা, প্রয়োজন পড়লে যে কোন মুহূর্তে কথা বলতে পারব আমি। এখন শুধু যুক্তরাষ্ট্র বাকি।'

'কাল রাতের মধ্যে পৌঁছবে তুমি ওখানে?' প্রশ্ন করল বিজ্ঞানী।

'দুপুরের মধ্যে।'

দীর্ঘ নীরবতা। কাগজের খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। 'ওখানে তোমার যারা আছে, তাদের ব্যাপারে শিওর তুমি, প্যাট্রিক?'

'পুরোপুরি।'

'হুম! ওদের বলবে, সবদেশের সরকারকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেব আমি দাবি মেনে নেয়ার। যদি তা মানা না হয়, কাজ সারতে যেন এক সেকেন্ডও দেরি না করে, সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দেবে কুলিঙ সিস্টেম।' একটু বিরতি। হাসল লেয়ার্ড। 'তবে সেসবের প্রয়োজন হবে না, আমি জানি। সব সরকারই বুঝবে আমার হুমকি কার্যকর হলে কি পরিণতি ঘটবে পৃথিবীর। জেনে রেখো, এটাই হবে প্রথম হুমকি, বিশ্বকে যার কাছে মাথা নত করতে হবে। করতেই হবে। নইলে···'

'অর্ধেক জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর,' বিজ্ঞানীর হয়ে আরগুয়েলো

শেষ করল বাক্যটা।

স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা। কি দুষ্কর্ম ঘটাতে যাচ্ছে লোকটা?

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'একদিনের মধ্যে দুটোর কাজ শেষ হবে তো?'

'অবশ্যই হবে। ইন্ডিয়ান পয়েন্ট ইউনিট থ্রীর লীডারের সঙ্গে গত সপ্তায় কথা বলেছি, এখন বাকি কেবল সান ওনোফ্রি ইউনিট ওয়ানের সাথে কথা বলা। চব্বিশ ঘণ্টা যথেষ্ট সময়। সেরে ফেলব এর মধ্যে।'

'গুড,' বলল রজার সাইমুর। 'তাহলে আসছে বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সামার টাইম দুপুর বারোটায় কাজ শুরু করব আমি।'

'আরেকটা ব্যাপার···'

'কোনটা?' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠ।

'সময়মত সিগন্যাল দেবেন কি করে আপনি?'

খিক্-খিক্ করে হাসল সে। 'তোমার ওদের কাছে রিসিভার আছে, প্যাট্রিক। তোমার সাথেও আছে। ওগুলো অন রেখো সময়মত, বাকি দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু ওরা যদি রেডিও সিগন্যাল পিনপয়েন্ট করে ফেলে?'

'বলেছি তো, ওসব নিয়ে আমাকে ভাবতে দাও। তুমি তোমার কাজ নিয়ে মাথা ঘামাও। সব যেন···'

চাপা একটা ক্লিক! শব্দে বিদ্যুৎপৃষ্ট হলো রানা, দরজার দিক থেকে এসেছে শব্দটা। ঝট করে ঘুরে তাকাল ও, দেখতে পেল ডোর হ্যান্ডেল নিচের দিকে নামছে একটু একটু করে। এক ঝটকায় হেডসেট খুলেই রেকর্ডারসহ ওটা ধাঁ করে বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিল ও, খাট থেকে নেমে দ্রুত এগোল দরজার দিকে। হাতল ধরে আচমকা এক টানে হাঁ করে খুলে ফেলল।

রুমের মধ্যে প্রায় উড়ে এসে দাঁড়াল রোজালিন। আরেকটু হলে পড়েই যেত, অন্য হাতে ধরে ফেলল ও চট্ করে। খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরল মেয়েটি, লাফ দিয়ে দরজার হাতল ধরল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। নিজের জায়গায় আপনাআপনি ফিরে গেছে দরজা—ক্লিক! শব্দে লেগে গেছে ইলেক্ট্রনিক লক্।

'যাহ্!' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোজালিনের, আহাম্মকের মত রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আটকা পড়ে গেলাম ভেতরে।'

নাইট গাউন পরা মেয়েটিকে দেখল ও। 'কেন?'

'এই দরজা ভেতর থেকে খোলে না, খোলে বাইরে থেকে,' ভয়ে ভয়ে বলল সে। 'সেফটি ইলেক্ট্রনিক লকিঙ সিস্টেম।'

'সে আমি আগেই বুঝেছি,' বলল রানা। 'বুঝিনি কেবল কাউকে খাতির করে ডেকে এনে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লক্ করে দেয়া কোন্ সিস্টেম।'

খোঁচা খেয়ে সুন্দর মুখটা কালো হয়ে উঠল তার। বিড়বিড় করে বলল, 'এ সব চাচার কাজ, মিস্টার রানা। আমি জানি না।' খানিক ইতস্তত করল। 'খোলা যাবে না মানে, যাবে, ইন্টারকমে জিরো ডায়াল করে সুইচবোর্ডকে বললে ওরা খুলে দেবে, অবশ্য যদি লেয়ার্ডের আপত্তি না থাকে।'

'তাহলে আর সমস্যা···' মেয়েটিকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ও।

'সমস্যা আছে। নিয়ম অনুযায়ী সকালের আগে এ দরজা খুলবে না ওরা। যদি বিশেষ কোন কারণ দেখিয়ে খোলাতে চান আপনি, কেউ না কেউ আসবে, আমার আসার কথা জানাজানি হয়ে যাবে।'

গোপন সঙ্কেতটা তাহলে ঠিকই দেখেছিল তখন, ভাবল রানা।

'সাথে ইলেক্ট্রনিক চাবি থাকলে অবশ্য খোলা যেত ভেতর থেকে,' আবার বলল সে। 'কিন্তু আমার কাছে নেই ও জিনিস। দেয় না কখনও চাচা। দুটো মাত্র চাবি, একটা নিজের কাছে রাখে, অন্যটা থাকে মের কাছে। আমিও এখানে একরকম বন্দীই।'

'দুঃখিত।'

'একটা সিগারেট দেবেন?'

প্যাকেট থেকে দু'জনের জন্যে দুটো সিগারেট বের করল ও, রোজালিনেরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজে ধরাল। এটা কোন ফাঁদ নয় তো? ভাবছে রানা, লেয়ার্ড ওকে টেস্ট করবে বলছিল তখন আরগুয়েলোকে, এ তা নয় তো? 'আপনার কাছে চাবি না থাকার কারণ, মিস···'

'রোজ, প্লীজ!'

'ওকে, রোজ।' বিছানা ইঙ্গিত করল ও। 'দাঁড়িয়ে থেকে শুধু শুধু পা দুটোকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বোসো।'

'বরং ওটায় বসি,' রুমের অন্য প্রান্তের একটা আর্মচেয়ারের দিকে এগোল মেয়েটি। এক হাতে গাউনের পেছনটা সমান রেখে বসল পায়ের ওপর পা তুলে। নীরবে ওকে দেখতে থাকল রানা। 'মিস্টার···'

'শুধু রানা।'

অধৈর্যের মত মাথা দোলাল রোজালিন। 'তুমি নিশ্চই ভাবছ এতরাতে এই বেশে এখানে কেন এসেছি আমি?'

' "না" বললে মিথ্যে বলা হবে,' মুচকে হাসল ও।

'আমি জানি না কথাগুলো তোমাকে বলে কোন বিপদে পড়ব কি না। তবু এসেছি তোমার সেদিনের উপকারের কথা মনে রেখে। সেদিন যদি নেকলেসটা ফেরত না দিতে তুমি, মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নটাও হাতছাড়া হয়ে যেত আমার আর সবকিছুর মত।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'আর সবকিছু বলতে?'

'সবকিছু। আমার বাবার সম্পত্তির অংশ, আমার প্রাপ্য, সে-সব মীন করতে চাইছি আমি।'

'লেয়ার্ড সব কেড়ে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' করুণ হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'আমার বাবা-মাকেও।'

'মানে?'

'ঐতিহ্য অনুযায়ী এ পরিবারের বড় ছেলে হয় লেয়ার্ড। আমার বাবা ছিল চাচার বড়, অর্থলোভী রজারের তা পছন্দ হয়নি। তাই প্লেন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে সে নিজের লেয়ার্ড হওয়ার পথ পরিষ্কার করার জন্যে।' খানিক বিরতি দিল সে। 'আমার কথা থাক। আমি এসেছিলাম তোমাকে সাবধান

করতে, রানা। চাচা যদি তোমাকে কোন কাজের প্রস্তাব দেয়, রাজি হয়ে যেয়ো না। বিপদে পড়ে যাবে।'

'কেন?'

'গত কিছুদিন থেকে আজব কিছু ঘটে চলেছে এ দুর্গে। চাচা আর মেকে খুব বেশি রকম ব্যস্ত মনে হচ্ছে আমার। বাইরের এক লোক প্রায়ই আসে, চাচা তাকে প্যাট্রিক নামে ডাকে। খুব সম্ভব স্প্যানিশ লোকটা, জানি না। অ্যাকসেন্ট শুনে মনে হয়। ভয় হচ্ছে চাচা বোধহয় ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু আমাকে তার প্রস্তাবে রাজি হতে নিষেধ করার কারণ কি?' আগুন নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে দিল রানা।

'কারণ আমার বিশ্বাস সে তোমাকে বিপজ্জনক কোন কাজের প্রস্তাব দেবে। তার গত কিছুদিনের আচরণ খুবই অস্বাভাবিক লেগেছে আমার। এতসব কি নিয়ে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কি এক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর সম্পর্কে চাচা আর মেকে আলোচনা করতে শুনি মাঝেমধ্যে, তাও পরিষ্কার না। শুনেছি অনেক টাকা লাগবে কাজ শেষ করতে। মনে হয় ওই কাজের সাথে তোমাকে জড়াতে চাইছে ওরা।'

'তুমি আমার পেশা জানো, রোজ,' বলল ও। 'আমার সব কাজেই অল্প-বিস্তর বিপদ থাকে। এটায় না হয় একটু বেশি বিপদই হবে, তাতে কি?'

অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখল মেয়েটি। তারপর মাথা দোলাল নিজের মনে। 'তোমাকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য ভেবে এসেছিলাম আমি, রানা,' নিচু কণ্ঠে বলল। 'করে গেলাম। এরপর তুমি কি করবে সে তোমার ব্যাপার।'

'তুমি কি ভেবেছ ভয় পেয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যাব আমি, তোমাকে নিয়ে? সেই জন্যেই এসব বলতে এসেছ?' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'না, সেজন্যে আসিনি।' রাগের আভাস দেখা গেল তার চোখে। 'তুমি ভুল লাইনে ভাবছ।'

'একটু আগেই না বললে, তুমিও এখানে আমারই মত বন্দী?'

'বলেছি। তাতে কি? আর যে-ই হোক, আমি অন্তত এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারব না। লেয়ার্ড সে পথ রাখেনি।'

'কিরকম?'

'টাকা-পয়সা নিজের বলে কিছু নেই আমার। অ্যাকাডেমিক শিক্ষা নেই, সার্টিফিকেট নেই। ছোটবেলা থেকে পরিবারের ঈতিহ্য অনুযায়ী আর সবার মত সবকিছুতে চাকর বাকরের ওপর নির্ভর করে এসেছি। এক কাপ কফি পর্যন্ত তৈরি করতে পারি না। পালিয়ে গিয়ে কি করে খাব?'

'কাউকে বিয়ে করে···'

'সে পথও নেই আমার,' চেহারা বিষণ্ন হয়ে উঠল রোজালিনের।

'কেন?'

কয়েক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও। তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে বলতে শুরু করল, 'অল্পবয়সে আমাদের এস্টেটের এক কর্মচারীর প্রেমে পড়েছিলাম। খুব ভাল ছিল ছেলেটা। একদিন ওর সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরা পড়লাম মের চোখে। সেদিনের পর ছেলেটা যে কোথায় চলে গেল, আজও পর্যন্ত

জানতে পারিনি আমি। আমার অনুমান ওকে মেরে ফেলেছে লেয়ার্ড।

'এরপর, চার বছর আগে একবার প্যারিস গেলাম তার সাথে। যে হোটেলে উঠলাম, তার বেভারিজ ম্যানেজার ছেলেটাকে পছন্দ হলো, ভালবাসলাম তাকে। কেউ যে ব্যাপারটা টের পেয়েছে, দু'জনের একজনও টের পাইনি। একদিন দুপুরে হোটেলের বাথরুমে ছেলেটার লাশ পাওয়া গেল। জবাই করে রেখে গেছে কেউ। শেষবার, দু'বছর আগে ভাল লাগল এক ইটালিয়ান ধনীর ছেলেকে,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোজালিন। 'একদিন সে-ও মরল।'

চুপ করে কি যেন ভাবল রানা খানিক। 'তার মানে যে তোমার কাছে এসেছে, তাকেই মরতে হয়েছে?'

নতমুখে ওপরে-নিচে মাথা দোলাল মেয়েটি।

উঠল ও। কাছে গিয়ে দুই বাহু ধরে দাঁড় করাল তাকে, কিছু বুঝে আগেই চট করে হালকা চুমু খেলো ঠোঁটে। 'আমি একবার ঝুঁকি নিয়ে দেখতে চাই কি পরিণতি হয় আমার।'

কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে রানাকে দেখল রোজালিন, মাথা ঝাঁকাল দ্রুত। 'আমি···আমি সত্যি বলছি, রানা।'

'আমি বিশ্বাস করেছি।'

'তারপরও···!'

'হ্যাঁ, তারপরও।'

'না, প্লীজ, ছাড়ো!' রাগ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হেসে উঠল সে। 'নেই নেই করেও অনেকদিন পর একটা আশা জেগেছে তোমাকে দেখে, হয়তো তুমিই আমার শেষ ভরসা। সুযোগটা নষ্ট হতে দিতে চাই না আমি, রানা। যদি সত্যি খারাপ কিছু ঘটে এখানে, যদি পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তোমার, একমাত্র আমি পারব তোমাকে সাহায্য করতে।'

'যদি পরিস্থিতি সেরকম হয়,' গম্ভীর হলো ও। 'তোমার জন্যে ফিরে আসব আমি, রোজ। তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে।'

এর মধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে রানা, সাইমুরের ইচ্ছেয় নয়, নিজের গরজেই এসেছে মেয়েটা দেখা করতে। রানাকে পরীক্ষা করতে হলে নিজের তরফের এত খবর জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না লেয়ার্ডের, বরং ভাইঝিকে দিয়ে রানার পেটের কথা বের করাবার চেষ্টা করত। কিন্তু ঘটছে উল্টো।

প্রয়োজন পড়লে দুর্গ থেকে পালিয়ে যাবে রানা, সেরকম পরিকল্পনাই আছে। যদি দেখা যায় আরগুয়েলোর সাথে সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাবার পরিকল্পনা করছে লেয়ার্ড, তাহলে বেরিয়ে গিয়ে সাথের সিগন্যাল পেন দিয়ে সঙ্কেত দেবে বিএসএসকে। তারপর বিএসএসের নির্দেশ এয়ার বেজে পৌঁছতে যা দেরি, একযোগে আকাশে উঠবে চার-চারটে বোমারু, ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবে সাইমুর ক্যাসেল।

কিন্তু সে সব এখনই নয়। তার আগে রানাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে লেয়ার্ড কি পরিকল্পনা করছে।

'কিন্তু আগে আমাকে জানতে হবে তোমার চাচা আসলে কি কাজের প্রস্তাব

দিতে চাইছে,' কথার জের টেনে বলল ও। 'দেখি কাল কথা বলে। কি আলাপ হয়, পরে জানাব তোমাকে।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করে সায় দিল রোজালিন। 'তবে আমার মন বলছে, পালাতে হবে তোমাকে।'

'তুমি শিওর?'

'মোটামুটি। স্প্যানিশ যে লোকটার কথা বললাম, সে এখন দুর্গেই আছে। তোমার সামনে তাকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে লেয়ার্ড। আমাকেও কড়া হুকুম দিয়েছে ভুলেও যেন তার কথা তোমার সামনে উচ্চারণ না করি।'

'হুঁম।'

'কাল ভোরে শুনেছি চলে যাবে সে চাচার কন্টার নিয়ে।'

'কন্টার!' এই জন্যেই, ভাবল রানা, এই জন্যেই বিএসএস এতদিনেও জানতে পারেনি ব্যাটা সবার অজান্তে কোন পথে বেরিয়ে যায় প্রতিবার।

'হ্যাঁ, প্রত্যেকবার ওটায় চড়েই যায় লোকটা।'

একই বিছানায় ঘুমাল ওরা মাঝে ভদ্র দূরত্ব রেখে। খুব ভোরে রোজালিনকে জাগিয়ে দিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকস আর সোয়েট শার্ট পরে '()' ডায়াল করল রানা ইন্টারকমে। সুইচবোর্ডকে জানাল; ওর রুমের দরজা বাইরে থেকে খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে, খুলছে না, খুব সম্ভব জ্যাম হয়ে গেছে কোনভাবে। এক্সারসাইজ করতে বের হবে ও।

কাজ হলো। একটু পর খুলে গেল দরজা। সময়টা সম্ভবত লেয়ার্ডের অনুমতির জন্যে ব্যয় হয়েছে সুইচবোর্ডের। বাইরে এসে চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখে নিল রানা, কেউ নেই দেখে ইঙ্গিতে বের হতে বলল রোজালিনকে। নিরাপদেই নিজের রুমে চলে গেল সে। রানা বের হলো এক্সারসাইজ করতে। ভোরের আলো সবে ফুটি ফুটি করছে তখন।

একটু পর দূরাগত এক কপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল।

ছয়

টানা এক ঘণ্টা জগিং করে ফিরে এল ও। মাথার মধ্যে আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আরগুয়েলোর সাথে লেয়ার্ডের আলোচনার যতটা শুনেছে ও রাতে, তাতে মোটামুটি পরিষ্কার, বড় ধরনের কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে চলেছে সে আগামী বৃহস্পতিবার।

আমেরিকার যে দুটো জায়গার নাম শোনা গেছে, রানা জানে, ওখানে দুটো নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট আছে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না ওগুলোই তার টার্গেট, কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স আর জার্মানির টার্গেট কোথায় কোথায়? আরগুয়েলোর লোকেরা কি ওসব প্ল্যান্টের সাথে জড়িত? নইলে কি করে কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দেবে ওরা সময়মত?

ওয়ারলক! ওয়ারলক কি ধরনের নাম হলো? ওইদিন ব্রিটিশ সামার টাইম দুপুর বারোটায় ফ্রান্স আর জার্মানিতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। আমেরিকার ইন্ডিয়ান পয়েন্ট ইউনিট থ্রীতে তখন বাজবে সকাল সাতটা, সান ওনোফ্রি ইউনিট ওয়ানে ভোর চারটে। ঠিক কি ঘটাবে তখন ওয়ারলক?

জানতে হবে, ঠিক করেছে ও। হাতে দু'দিন সময় আছে, এর মধ্যে ওয়ারলকের পরিকল্পনা জানতে হবে। কিন্তু কি করে?

রূমে ফিরে তীক্ষ্ণ চোখে ব্রীফকেসটা পরীক্ষা করল রানা। ঠিকই আছে দেখা গেল। হাত দেয়নি ওটায় লেয়ার্ড। নিশ্চিন্ত মনে আরও কিছুক্ষণ বুক ডন, ওঠবস ইত্যাদি করল। লম্বা সময় নিয়ে শাওয়ার-শেভ সেরে ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। লাইটওয়েট প্যাকসের সাথে ম্যাচিঙ বিজ শার্ট ও কর্ড অ্যানোরাক পরে নরম চামড়ার মোকাসিন পায়ে দিল।

তখনই টোকা পড়ল দরজায়। 'ইয়েস?'

পাল্লা ফাঁক করে উঁকি দিল বাটলার হ্যারি। 'গুড মর্নিং, স্যার। ব্রেকফাস্ট রেডি।'

'গুড মর্নিং। আসছি আমি।'

মে হরোইৎজ ও রোজালিনকে দেখল রানা ডাইনিঙ রূমে। লেয়ার্ড তখনও আসেনি। সাড়ম্বরে ওকে অভ্যর্থনা জানাল তারা। মের হাসি কালকের চেয়ে আজ আরও বেশি প্রাণবন্ত, প্রশস্ত মনে হলো রানার। ভেতরে আনন্দের বান ডেকেছে যেন। রোজালিন আগের মতই, তবে চাঁউনি একটু অন্যরকম। কিছু একটা আছে ওখানে–হয়তো···। রানার ভাবনায় বাধা দিয়ে রূমে ঢুকল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি।

রানাকে দেখে মনে হলো যেন ভারি সন্তুষ্ট হয়েছে। 'আপনার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, মিস্টার রানা, কারণ আজ বিকেল পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। আপনাকে সময় দিতে পারব না। হাতের কাজটা সেরে তবে আপনার সাথে বাকি আলোচনা সারব, কেমন? মেয়েদের সাথে গল্প করে সময়টা পার করুন, প্লীজ!'

'কোন অসুবিধে নেই, লেয়ার্ড,' বলল ও। 'আগের কাজ আগে নীতিতে বিশ্বাসী আমি।' আসলে সময়টা নিচ্ছে সে ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে, ভাবল রানা। ব্যাকগ্রাউন্ড যদি মনমত না হয়, তাহলে নিশ্চই আলোচনার পিছনে সময় নষ্ট করবে না।

'আমারও একই নীতি,' দুই কান পর্যন্ত হাসি দিল বৃদ্ধ পাখি নড়ের সাথে। 'আগে কাজ, তারপর আর সব।'

দুপুর পর্যন্ত বসেই কাটাল রানা। ভেতরের অস্থিরতা চেপে গল্প করল মে আর রোজালিনের সাথে। ওর আসর জমানো চুটকি শুনে হেসে খুন হলো দু'জনেই। চোখে দেখেনি রানা, তবে মনে হয়েছে পুরোটা সময় দরজার বাইরেই পাহারায় ছিল নিঃশব্দচারী বাটলার লোকটা। আর মে, এক মুহূর্তের জন্যেও বের হয়নি রূম ছেড়ে। রানা ও রোজালিন যাতে ঘনিষ্ঠ হতে না পারে, একান্ত কোন আলোচনা করতে না পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল মহিলার।

অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না রানাকে। বোঝা গেল, লেয়ার্ডের

খবর সংগ্রহের সূত্র যে-ই হোক খুবই কাজের মানুষ। দুপুরে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়েছিল ও, খানিক পর দরজায় ব্যস্ত টোকা শুনে উঠে পড়ল। স্বয়ং লেয়ার্ডকে দোরগোড়ায় দেখে বিস্মিত হলো। 'আমার কাজ শেষ,' চওড়া হাসি দিয়ে বলল লোকটা। 'ভাবলাম আপনার সাথে কাজের কথা এখনই সেরে ফেলি। অসুবিধে ঘটালাম না তো?'

'মোটেই না।'

'আসুন তাহলে। অন্য কিছু দেখাব এবার আপনাকে,' বলে ওর মতামতের অপেক্ষায় থাকল না সে, প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরে চলল।

হলরুম পেরিয়ে ড্রইংরুমের শেষ মাথায়, সার্কুলার স্টেয়ার কেসের নিচ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে এক কাঁচের সুইং ডোর হয়ে লম্বা করিডরে পড়ল রানা লেয়ার্ডকে অনুসরণ করে। এটা দুর্গের পুরনো অংশ, আধুনিক মেরামতির ছোঁয়া লাগেনি এদিকটায়। অর্ধেক করিডর পেরিয়ে ভারী এক ওক কাঠের দরজার সামনে থামল লেয়ার্ড। দরজার চার কিনারা পুরু স্টীল দিয়ে মোড়া। পকেট থেকে গোছা বের করে চাবি বাছাই করল সে, পটে ঢুকিয়ে দু'বার মোচড় দিয়ে খুলল। দীর্ঘদিনের বদ্ধ বাতাসের গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে।

ভেতরে একসার চওড়া ধাপের সিঁড়ি দেখল রানা, কত নিচে গিয়ে শেষ হয়েছে বুঝতে পারল না অবশ্য। কয়েকটা টিমটিমে গাইড লাইট আছে সিঁড়িতে, তাতে বেশিদূর দেখা যায় না। বিজ্ঞানীর ইঙ্গিতে তার পাশাপাশি নামতে শুরু করল ও। দশ-বারো ধাপ নেমে কথা বলে উঠল লোকটা।

'কাল আমার স্টাডি দেখেছেন আপনি, আজ দেখবেন দুর্গের খুবই ইন্টারেস্টিঙ আরেক অংশ। খুব পুরনো। সাইমুর বংশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ বলা যায় জায়গাটাকে।'

নীরবে নামতে থাকল রানা। মনে হচ্ছে সোজা পাতালপুরীতে নেমে গেছে সিঁড়ি, শেষ নেই। অনেকক্ষণ পর সমতল মেঝেতে পৌঁছল দু'জনে। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা লিভার ধরে নিচের দিকে টান দিল লেয়ার্ড, আচমকা উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠল চারদিক। চোখ সয়ে আসতে পিট্ পিট্ করে তাকাল রানা। মেঝেটা পাথরের, আয়তাকার-বিশ বাই চল্লিশ হবে সম্ভবত। ওর নাক বরাবর সোজা একটা সরু প্যাসেজ, পাঁচ ফুটের মত চওড়া। পনেরো ফুট দীর্ঘ। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা।

ডানে-বাঁয়ে আরও দুটো দরজা। প্রথমটার চেয়ে বেশ চওড়া। সিলিঙ অনেক উঁচু এখানকার। সামনের দরজাটা দেখাল লেয়ার্ড। 'ওটা দুর্গের প্রাচীন গুপ্ত পাতালপুরীতে যাওয়ার পথ,' বলে হাসল। 'মাঝে মধ্যে ব্যবহার হয় আজকাল। আমাদের ডানের রুমটা টর্চার চেম্বার। আসুন, দেখবেন ভেতরটা।'

কেন ও-রুম দেখানোর প্রয়োজন পড়ল বুঝেও না বোঝার ভান করল রানা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল লোকটা। ভেতরের বাতাস আরও ভারী, গুমোট লাগল ওর, নাক কুঁচকে উঠল আপনাআপনি। ভেতরে যা দেখল, সবই প্রাচীন, মানুষ মারা যন্ত্র। চাবুক, কাঁটার মুকুট, নখ উপড়ানোর পিলে চমকানো সাইজের সাঁড়াশী, জ্বলন্ত কয়লা রাখার তাওয়া, লোহার বুটসহ আরও অসংখ্য

হাবিজাবি। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল ওর লোহার বুট। কম করেও দেড় মন ওজন হবে একেকটার।

'এর সবই পুরনো স্কটিশ প্লেজারের অংশ, মিস্টার মাসুদ রানা। বিদ্রোহী প্রজাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হলে ওই বুট পরিয়ে ফেলে দেয়া হত পাহাড় থেকে,' শ্রাগ করল লেয়ার্ড। 'বুঝুন, কি অবস্থা হত তার। একটা হাড়ও আস্ত থাকত না।'

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার!' শিউরে ওঠার ভান করল রানা। এসবের সাথে একেবারে অপরিচিত নয় ও, জানে কোনটার কি কাজ। কোন কোনটার নির্যাতন সইবার অভিজ্ঞতাও আছে। সামনে তাকাল ও। রুমের শেষ মাথায় কিছু একটা দেখে মুহূর্তের জন্যে রক্ত হিম হয়ে গেল।

এক কোণায় সম্ভবত পরে তৈরি করা ছোট একটা সাব-রুম, সামনেরদিকটা উন্মুক্ত। ভেতরের তিন দেয়াল সাদা টাইলের। তার মাঝখানে আধুনিক এক অপারেটিঙ টেবিল, ওপাশে বড় এক কাঁচের কেবিনেট। ভেতরে চক্‌চক্ করছে নানান যন্ত্রপাতি—সিরিঞ্জ, ইঞ্জেকশন। মানুষকে জ্যান্ত মারার জিনিস সব।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল লেয়ার্ড। শব্দ করে হাসল। 'দেখতেই পাচ্ছেন, ওরা প্রাচীন নয়, অত্যাধুনিক। যুগের সাথে নির্যাতনের মাধ্যমও বদলে গেছে কি না! মাঝেমধ্যে কাজে লাগে রুমটা।' পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে উঠল। 'আমার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেয়ার আগে এসব কেন দেখাচ্ছি আপনাকে জানেন? আপনাকে সতর্ক করতে। যাকে কাজে নিয়োগ করি, তার কাছ থেকে কমপ্লিট লয়্যালটি চাই আমি, আপনার বেলায়ও চাইব। তাই দেখালাম। আমার নির্দেশের অন্যথা হলে এখানে আসতে হয় সবাইকে,' শেষ বাক্যটা আরেকদিকে ফিরে বলল সে। যেন ওকে নয়, অন্য কাউকে বলছে।

'আসুন,' বলে হাঁটা ধরল লোকটা। আয়তাকার জায়গাটা পেরিয়ে উল্টোদিকের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। এটায় তালা মারা। তালা খুলে দরজা মেলে ধরল সে, পাখি-নড করে আবার বলল, 'আসুন। এটা আমার অপারেশন রুম।'

আগেরটার প্রায় দ্বিগুণ বড় এটা। সিলিঙ নিচু, দেয়ালে ধূসর রঙ। প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের প্রায় সব ধরনের ফায়ার আর্মসের মেলা বসিয়েছে এ রুমে লেয়ার্ড। সব শৈল্পিক নিপুণতায় দেয়ালে ঝোলানো। ছুরি, চাকু, চমৎকার কারুকাজ করা ঢাল-তরবারী, ক্রস বো, হুইল-লক্ পিস্তল, ফ্লিন্ট-লক্ পিস্তল, মাস্কেটসহ আরও অনেক কিছু। রুমের ও মাথায় আছে অত্যাধুনিক অস্ত্রের সংগ্রহ—রাইফেল, সেমি অটো-কারবাইন, পিস্তল আর অটোম্যাটিক রাইফেল, মেশিন-পিস্তল ইত্যাদি।

লোকটাকে সামান্য খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না রানা। 'কোন থার্মোনিউক্লিয়ার ডিভাইস দেখছি না যে?' বলল হাল্‌কা সুরে।

ভুরু কোঁচকাল লেয়ার্ড। 'চেনেন সেসব?'

'দুই একটা,' শ্রাগ করল ও। 'ছবি দেখেছি।'

'আমি রাখিনি। প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে ওসব, সবাইকে ধ্বংস করার জন্যে।'

মাথা দোলাল অন্যমনস্ক রানা। নজর পড়ে আছে শেষ মাথার কাঁচঘেরা পার্টিশনের ভেতরের বড় এক কনসোল ডেস্কের ওপর। কয়েকটা কম্পিউটর মনিটর, রেডিও ইকুইপমেন্ট প্রায় ঢেকে রেখেছে ডেস্কটাকে। তার পিছনের দেয়ালে ঝুলছে বিশাল এক ট্রান্সপ্যারেন্ট ওয়ার্ল্ডম্যাপ। ম্যাপের কয়েকটা জায়গা চায়নাগ্রাফের মার্কিং দেখে দু'চোখ দূরবীন হয়ে উঠতে চাইল রানার, কিন্তু কাজ হলো না। পড়ার উপায় নেই জায়গাগুলোর নাম।

ডেস্কের পিছনের এক সুইভেল চেয়ার দেখাল ওকে লেয়ার্ড। 'ওখানে বসে আমি একদিন পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করব, মিস্টার মাসুদ রানা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'একদিন। খুব শিগ্‌গিরি।'

আরেকবার ম্যাপের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। আমেরিকার ম্যাপের দুই জায়গায় দুটো মার্কিঙ দেখা গেল—নিশ্চই ইন্ডিয়ান পয়েন্ট ইউনিট থ্রী, ভাবল ও। অন্যটা সান ওনোফ্রি পয়েন্ট ওয়ান, কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপের দিকে নজর দিল। জ্বলজ্বলে মার্কিঙগুলো স্পষ্ট, তাছাড়া ওর জানা আছে কোন্ কোন্ দেশ ওগুলো, তাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে জায়গাগুলোর নাম পড়া সম্ভব হলো না।

ম্যাপ থেকে চোখ সরাতে প্রচণ্ড মনের জোর খাটাতে হলো ওকে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে সন্দেহ করে বসতে পারে লেয়ার্ড। ধীরে, নিজেকে বোঝাল রানা, ধীরে। ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, এতদূর যখন আসা গেছে, ভেতরের কিছুই অজানা থাকবে না।

'সত্যি?' হাসল ও।

'হাসবেন না, আমি হাসির কিছু বলিনি।' একটু থামল সে। 'আপনি জানেন আমি কে? আমার আসল পরিচয় কি?'

'জানি। আপনি ডক্টর রজার সাইমুর, লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি।'

নাক দিয়ে হাসল লোকটা। গাধা কিসিমের কারও ওই জাতীয় কথাবার্তা শুনে যেমন তাচ্ছিল্যের হাসি দেয় মানুষ, তেমনি। 'ওটা ছাড়াও আমার আরেকটা পরিচয় আছে। আমি সম্ভবত পৃথিবীর সর্বকালের সেরা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।'

'আচ্ছা!' অবাক হয়েছে যেন, এমনভাবে তাকাল ও।

সন্তুষ্ট হয়ে ওপরে-নিচে মাথা দোলাল লেয়ার্ড। 'হ্যাঁ। এবং যারা বর্তমান পদ্ধতির নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের অবলুপ্তি দাবি করছে, আমি তাদের দলে। কারণ ওগুলোর যে সিস্টেম, তা মোটেই নিরাপদ নয়। এর ভয়াবহ পরিণতি জেনেশুনেও চেপে রেখেছে সরকারগুলো, সাধারণ মানুষকে জানতে দিচ্ছে না। বরং যারা এ কথা বলতে গেছে, তাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। আমার ব্যাপারেও তাই করেছে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, বাধ্য করেছে আমাকে চাকরি ছাড়তে। অথচ আমি যা করতে চেয়েছি, সারা বিশ্বের উপকার হবে জেনেই করতে চেয়েছি। আপনি জানেন বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কিভাবে?'

'জেনারেটরের সাহায্যে,' বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ও, যেন জানতে চায় উত্তরটা সঠিক হয়েছে কি না।

'ঠিক বলেছেন। এই জেনারেটর অপারেট করতে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার

হয়। হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে পানি, অন্য আর সব প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে ফুটন্ত পানির বাষ্প। পরের ক্ষেত্রে তেল, কয়লা বা গ্যাসের সাহায্যে ফোটানো হয় পানি–কখনও নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কোরের মাধ্যমেও।' হাসল বিজ্ঞানী। 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মাধ্যমে পানি ফোটানো···খুব খরচবহুল মনে হয় না আপনার?'

ওর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে খুক্ করে কাশল সে। 'খুবই খরচবহুল। অকল্পনীয় খরচ হয় এতে, জনগণের ট্যাক্সের টাকার শ্রাদ্ধ হয়। এই সিস্টেমকে প্রফেসর লোভিন আখ্যা দিয়েছিলেন "মাখন কাটতে করাত ব্যবহার"। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মূল সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গত কয়েক দশক ধরে যে পদ্ধতির রিঅ্যাক্টর কাজ করছে বিভিন্ন দেশে, এই সমস্যা তার প্রত্যেকটিতে আছে। এরমধ্যে অনেকগুলো দুর্ঘটনাও ঘটিয়েছে কোন কোনটা। প্রথম ধরুন বাহান্ন সালের কথা, ওন্টারিওর চক রিভার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা ঘটে সেবার। তারপর পঞ্চান্ন সালে আইডাহো ফলস, সাতান্ন সালে ইংল্যান্ডের উইন্ডস্কেল, আটান্নতে আবার চক রিভার, সত্তর সালে ইলিনয়, একাত্তরে মিনেসোটা, পঁচাত্তরে আলবামা, ছিয়াত্তরে ভারমন্ট, তারপর চেরনোবিল, আর কত দুর্ঘটনার কথা বলব? সোভিয়েত ইউনিয়নের কিশতিম ক্যাটাস্ট্রফের কথা জানেন, ইউরালে পারমাণবিক বর্জ্য ডাম্প করতে গিয়ে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছিল ওরা? প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কত প্রাণহানি ঘটেছে সে দুর্ঘটনায়, জানেন?

'এত ঘটনার পরও কোন সরকারের কানে পানি যায়নি, সেই পুরনো, বিপজ্জনক পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে আছে তারা। মুখ খুলতে রাজি নয়। সাতাত্তরে কার্টার প্রশাসন এ ব্যাপারে কিছুটা মুখ খুলেছিল অবশ্য। হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিল, দু'হাজার দুই সালের মধ্যে এ পদ্ধতির রিঅ্যাক্টরের কোর ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করবে বিশ্বে। গলে যাবে। অনুমান করতে পারেন কোর গলে গেলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে?'

চোখ কুঁচকে মাথা দোলাল রানা। 'জেন ফন্ডার এক ছবিতে কি যেন দেখেছিলাম একবার, চায়নাসিনড্রোম, না কি যেন। সে ধরনের কিছু?'

'আসুন,' ডেস্কের দিকে পা বাড়াল বিজ্ঞানী। 'বসে কথা বলি।'

ম্যাপটার অনেক কাছে আসতে পেরে স্বস্তি অনুভব করল ও। তখনই অবশ্য চোখ তুলল না। 'কি, বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, কোর মেল্টডাউনের ব্যাপারে,' সুইভেল চেয়ারে বসে আবার শুরু করল লেয়ার্ড। 'এই কোরের সাহায্যেই নিউক্লিয়ার প্যান্ট তাপ উৎপাদন করে, ইনরমাস হীট। কন্ট্রোলড্ চেইন সিস্টেম। সিস্টেম যতক্ষণ কন্ট্রোলে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু,' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। '···যদি রিঅ্যাক্টরের কুলিঙ সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দেয়, যদি কোন পাইপ ফুটো হয়ে যায়, তাহলে সমূহ বিপদ। সিস্টেম অকেজো হয়ে যাবে, অথচ কোর তার তাপ উৎপাদন ঠিকই চালু রাখবে। তাপ যত অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়বে ততই রেডিওঅ্যাকটিভিটি উৎপন্ন হবে, সব মিলিয়ে একসময় ফল হবে দর্শনীয়।

'দর্শনীয়?' চোখ কুঁচকে উঠল রানার।

'কথার কথা আর কি! এক মার্কিন কবি বলেছিলেন, "দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ডস, নট উইদ আ ব্যাঙ বাট আ হুইম্পার"। ঠিক তাই হবে। সামান্য ভূমিকম্প, দূরাগত মেঘের গুড় গুড় ডাক, তারপর শুরু হবে মাটির আড়মোড়া ভাঙা। রেডিওঅ্যাকটিভ ভস্ম ভেসে পড়বে বাতাসে। আর কোর এতই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে যে তা ঠেকানোর কোন উপায়ই থাকবে না। মাটি, পাথর, ধাতু, কিছুই পারবে না সে-উত্তাপ ঠেকাতে। যে-কোন প্ল্যান্টে যে-কোনদিন এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, মিস্টার মাসুদ রানা।

'এবং একমাত্র আমি পারি তা ঠেকাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সরকার আমাকে সে সুযোগ দিতে রাজি নয়। তাই ঠিক করেছি,' কড়া চোখে রানাকে দেখল বিজ্ঞানী। 'পৃথিবীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব আমি, ওরা কতবড় ভুল পথে চলছে। একই সাথে আমার তৈরি সিস্টেম কতখানি নিরাপদ, তাও দেখাব। নিশ্চই এ জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারেন না আপনি?'

মানুষটা দাম্ভিক তো বটেই, ভাবল রানা, উন্মাদও। ফ্যানাটিক। আন্তর্জাতিক অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের আর সব সদস্য যেন ছাগল, কিছুই বোঝে না। বোঝে কেবল রজার সাইমুর। একা এরই আছে দুনিয়ার মানুষের ভালর চিন্তা, আর কারও নেই।

'না,' মাথা দোলাল রানা। 'আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না।'

'যদি?' তিড়িঙ করে লাফিয়ে উঠল বিজ্ঞানী, প্রায় চিৎকার করে বলল, 'যদি মানে? কি বলতে চান আপনি? এ ব্যাপারে কতটুকু জ্ঞান আপনার, রানা? কি বোঝেন?' ধুম্ করে কিল মেরে বসল ডেস্কে। 'আমি বলছি আমি যা করতে যাচ্ছি তা শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ। আমি করে দেখাব হারামজাদা পলিটিশিয়ানদের। আমাকে অবহেলা করার জন্যে সব ব্যাটাকে আমার পায়ের সামনে নাকে খৎ দেয়াব, অপেক্ষা করুন।'

চুপ করে থাকল ও। এরমধ্যে দু'বার চোরা নজরে ম্যাপ দেখে নিয়েছে, ইওরোপের মার্কিঙগুলো কোথায় কোথায়, জানা হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডেরটা হেইশাম–তার পাশে লেখা এক। ফ্রান্সের লোকেশনের নাম সেইন্ট-লরেন্ট-দ-ইয়ক্স–দুই। জার্মানিতে আছে দুটো লোকেশন। একটা পুবে, রাশিয়ার ঘাড়ের ওপর–নর্ড টু-টু। অন্যটা পশ্চিমের এসেন্সহ্যামে। নামগুলো মস্তিষ্কে টুকে নিল রানা। অপারেশন কমপ্লিট, ভাবল। কোনরকমে বিএসএসে খবরটা পৌঁছে দিলেই খেল্ খতম হয়ে যাবে রজার সাইমুরের।

কিন্তু রাখো, এখনই নয়। সময় যখন আছে, আরেকটু খোশগল্প করতে বাধা কোথায়? চলছে চলুক না!

'কাজ হাসিল করতে এক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছি আমি। ওদের শিক্ষা দেয়া এবং প্রয়োজনীয় ফান্ড জোগাড় করা, দুটোই হবে।'

'কি করে?' প্রশ্ন করল রানা। ভেবেছিল মেজাজ এ মুহূর্তে গরম আছে ব্যাটার, গড়গড় করে সব বলে যাবে, কিন্তু হলো না তা।

'পুরো ব্যাপারটা একটু জটিল, মিস্টার রানা,' পাশ কাটিয়ে গেল সে। 'তার

সাথে এখনই আপনাকে জড়াতে চাই না। আপনি অন্য একটা কাজ করবেন আমার হয়ে।'

'সেটা কি?'

'অপারেশন শেষ হলে আমার বিরুদ্ধে কোন দেশের সরকার যাতে লিগ্যাল অ্যাকশন না নিতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা,' বলে হাসল লেয়ার্ড।

'কাজটা কি?' ঝুঁকে বসল ও।

'একজনকে খুন করা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। 'কি করে ভাবলেন আপনি বললেই আমি কাউকে খুন করতে ছুটব?'

'আপনার সম্পর্কে যা জেনেছি, তাতে না করতে চাইবার তো কারণ দেখি না,' মৃদু শ্রাগ করল লেয়ার্ড। 'তাছাড়া পারিশ্রমিকও প্রচুর দেব আমি। পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা অঙ্কটা আপনার স্বাভাবিক ফীর বহুগুণ বেশি।'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, লেয়ার্ড,' একঘেয়ে সুরে বলল ও। কাভার ডোশিয়ে পুরোই ব্যাটা জেনে গেছে বুঝতে পেরে খুশি। 'আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনি।'

'জানি না, কেমন?' পাখি-নড়ের সাথে মৃদু হাসল লোকটা। 'আপনিই বা কি করে ভাবলেন আপনার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর না নিয়েই এমন এক কাজের প্রস্তাব দেব আমি? এতই বুদ্ধু মনে হয় আমাকে?'

'কি ভাবে সম্ভব···?'

'অনেকভাবে সম্ভব, মিস্টার রানা। ইচ্ছে যদি আন্তরিক হয়, ভাবের অভাব হয় না,' চওড়া হাসি দিল বিজ্ঞানী। রসিয়ে রসিয়ে আবার বলল, 'মিস্টার রানা, ওরফে মেজর মাসুদ রানা, ওরফে বীরউত্তম। আর কিছু জানতে চান? আপনি বাংলাদেশের নাগরিক, জন্ম ঢাকায়, বাবার নাম, জাস্টিস···থাক্, আর বোধহয় প্রয়োজন নেই, তাই না?'

চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'তৃতীয় বিশ্বের কোন্ কোন্ দেশে কাকে কাকে খুন করেছেন আপনি, জানা হয়ে গেছে আমার। লন্ডনে কার সাথে জুয়া খেলায় হেরে বিশ হাজার পাউন্ড দেনা হয়েছেন, আগামী দশদিনের মধ্যে টাকাটা না পেলে সে আপনার কি দশা করবে, সব জানি। আরও এমন এমন সব তথ্য জানি, যা শুনলে আপনি অবাক হবেন। কিন্তু তার আর দরকার আছে বলে মনে করি না আমি। আপনার টাকা দরকার। কাজটা করে দিন, টাকা নিন।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল ওর, যেন নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করছে। 'কাকে খুন করতে বলছেন?' মুখ আঁধার করে বলল।

'লোকটার নাম প্যাট্রিক অলিভিয়েরো আরগুয়েলো।'

মোটেই অবাক হলো না রানা। তাকে দিয়েই নিজের প্ল্যান সফল করতে যাচ্ছে সাইমুর। ভবিষ্যতে যদি এ কাজের জন্যে কেউ তাকে ফাঁসাতে সফল হয়, সে এই অলিভিয়েরো। অতএব সময়মত লোকটার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। 'চিনলাম না।'

'স্মরণশক্তি একটু বাড়ান, পারবেন। পৃথিবীর সবচে' বড় সন্ত্রাসী–হাইজ্যাকিঙ, কিডন্যাপিঙ, বোমাবাজী, সবই করে সে। ওস্তাদ লোক। অনেক দেশে মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট।'

'ও। সেই আরগুয়েলো?'

নীরবে মাথা দোলাল লেয়ার্ড।

'তাকে কোথায় পাচ্ছি আমি?'

'আমার সাথে থাকলেই পাবেন। কখন কাজটা করতে হবে, তাও আমিই জানাব আপনাকে।'

'পঞ্চাশ হাজারে,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'শুধু ওকে কেন, ওর ব্যর্থ সার্টিফিকেটও হাওয়া করে দিতে রাজি আছি আমি।'

'সে কাজ বসে নেই,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আমি সেরে ফেলেছি। আপনি শুধু ওকে শেষ করুন, তাতেই চলবে।'

'কিন্তু আমার ফী?' গলায় খানিকটা কাঠিন্য ফোটাল রানা। 'কখন, কিভাবে পাচ্ছি আমি টাকাটা?'

'আপনি যখন যেভাবে চাইবেন। তবে কাজ শেষ হওয়ার পর।'

'কিন্তু···'

'আমার কথায় যদি আস্থা রাখতে না পারেন, আপনিই তাহলে একটা পথ ভেবে বের করুন। আমি আপত্তি করব না।'

চিন্তার ভান করল রানা। 'ঠিক আছে, রাতে ভেবে ঠিক করব।'

'সেই ভাল। কাল জানান আমাকে।'

নীরবে কেটে গেল কিছু সময়। 'আরগুয়েলোর সাথে কি সম্পর্ক আপনার?' প্রশ্ন করল ও। 'আপনার এই মিশনে ওর কোন পার্ট আছে?'

'অপারেশন মেল্টডাউন? আছে।' সুপ্ত লাভা নড়ে উঠল। 'ডিটেইলস জানার প্রয়োজন নেই আপনার, তবু, কিছুটা অন্তত শুনুন। জানার অধিকার আছে আপনার। দুনিয়ার সমস্ত সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে লোকটার, প্ল্যান সফল করতে তাই ওর সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকার ছয়টা মেজর নিউক্লিয়ার এস্টাবলিশমেন্টে আমার হয়ে তাদের থেকে ধার করা ছয় গ্রুপ এক্সপার্টকে ইনফিলট্রেট করিয়েছে সে। তা প্রায় এক বছর আগে। ওরা প্রত্যেকে সিরিয়াস, নিবেদিতপ্রাণ। আমার কাজ উদ্ধারে প্রয়োজন হলে মরতেও তৈরি সবাই। কাজ হলে ওরা প্রত্যেকে প্রচুর টাকা পাবে পুরস্কার হিসেবে, পৃথিবীর যে দেশে খুশি, গিয়ে বাস করতে পারবে। আর যদি আমি ব্যর্থ হই, ওরা মরবে। দুটোর কোনটাতেই অমত নেই লোকগুলোর। তবে,' থেমে নাকের ডগা চুলকাল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। 'পরেরটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। ওদের জানিয়ে দিয়েছি আমি আরগুয়েলোর মাধ্যমে। এবং ওরা সাফল্য আশা করছে, ব্যর্থতা নয়।

'ঠিক সময়ে স্থাপনাগুলোর কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে ওরা। তারপর, যদি তেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েই বসে, আপনি যে জিনিসটার নাম বললেন, চায়নাসিনড্রোম, তাই ছড়াতে শুরু করবে ভেতরে বসে। কারও

ঠেকাবার সাধ্য থাকবে না। যদি কাজটা করতে হয়, পৃথিবীর বেশ বড় একটা অংশের মানুষ, সম্পদ, সব শেষ হয়ে যাবে। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ মরবে রেডিওঅ্যাকটিভ ফলআউটের মরণ ছোঁয়ায়। আমি অবশ্য মনে করি না তেমন কিছু ঘটবে।

'আরগুয়েলো ওদের জোগাড় করেছে। আমি সবাইকে তার মাধ্যমে ট্রেনিঙ দিয়েছি, কাকে কোন এস্টাবলিশমেন্টে পুশ করতে হবে, ঠিক করে দিয়েছি। তাদের ইনফিলট্রেশনের কাজটাও আরগুয়েলোকে দিয়ে করিয়েছি। অর্থাৎ ও ছাড়া আর কেউ ব্যক্তিগভাবে চেনে না আমাকে। ওদের কারও তরফ থেকে বিন্দুমাত্র ভয় নেই আমার, আছে আরগুয়েলোর তরফ থেকে। এ কাজে বেশ বড় অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করব আমি, কথা আছে তার থেকে অর্ধেক ও নেবে। একা নয়, অন্যদের সবাইকেও নির্দিষ্ট একটা ভাগ দেবে ওখান থেকে।'

হাসল লেয়ার্ড। নড়েচড়ে বসল। 'ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আগে বেশ কিছু টাকা দিয়েছি আমি আরগুয়েলোকে, কিন্তু সে মনে হচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। চাপ দিয়ে আরও কিছু টাকা আদায় করতে চেয়েছিল এর মধ্যে, আমি দেইনি। দেবও না আর। দিয়ে লাভ নেই, কারণ ও আমার কাছে অলরেডি মৃত। মৃতের সাথে আবার কিসের লেন-দেন? ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন সিকিউরিটি ফোর্স দুনিয়ার সমস্ত সন্ত্রাসীকে ধরে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে তুলবে, তখন ও বেঁচে থাকলে আমার কথা ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।'

'এ না হয় মরল,' বলে উঠল মাসুদ রানা। 'অন্যদের কি হবে? ওরাও নিশ্চই টাকা পাচ্ছে না?'

'ঠিক, পাচ্ছে না। পাবে কি করে? যে ওদের টাকা দেবে সে-ই তো থাকছে না! তাছাড়া আমি যে রিঅ্যাক্টর তৈরি করতে চাই, তাতে প্রচুর টাকা লাগবে। বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড। কাজেই নিজেদের শেয়ার ওদের স্যাক্রিফাইস করতেই হবে।'

তা বটে, ভাবল ও। উপায় কি? মানুষটা যে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, তার কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে ঘাম ছুটে গেল। সাইমুর কি করে নিশ্চিত হলো যে সন্ত্রাসী স্কোয়াডগুলো যখন কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নেবে, তখন তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে না? নিজেরাই নেমে পড়বে না তার ভূমিকায়? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ব্যাটারা নিজেরা পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

প্রশ্নটা না করলেও চলত, কারণ এরমধ্যে নিজের পরবর্তী করণীয় ঠিক করে ফেলেছে রানা। তবু করল। নইলে সন্দেহ জাগতে পারে উন্মাদটার। 'আরগুয়েলোকে আমাকে দিয়ে হটাতে চাইছেন, ঠিক আছে। কিন্তু কাজটা করার পর আমাকেও যে আর কাউকে দিয়ে একই পথে পাঠাবেন না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?'

চেহারা আঁধার হয়ে উঠল লেয়ার্ডের। রেগে উঠছে বোঝা গেল। তবু শেষ পর্যন্ত সামলে নিল। মেঘ ফুঁড়ে রোদ বের হওয়ার মত করে হাসল জোর করে। কোন নিশ্চয়তা নেই, মিস্টার রানা। আমার মুখের কথা বিশ্বাস করা ছাড়া

আপনার কোন পথও নেই। যদি আমাকে অবিশ্বাস করতে চান, করতে পারেন। যদি দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে চান এই মুহূর্তে, কেউ বাধা দেবে না। চলে যান। কিন্তু যে মুহূর্তে মেইন গেটের বাইরে পা রাখবেন, মনে করবেন আপনি মরে গেছেন।

'দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তবে বের হওয়ামাত্রই কাজটা করব না আমি, করব রয়ে-সয়ে। আপনাকে যথেষ্ট সময় দেব সিকিউরিটি এজেন্সি বা পুলিসের কাছে আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে।' কপালের পাশ চুলকাল লেয়ার্ড চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'কেউ যদিও একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। তবু, মৃত্যুর আগে অন্তত একটা সান্ত্বনা তো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন যে না, চেষ্টা করেছিলাম আমি অমুককে ফাঁসাতে। পারিনি।'

দীর্ঘশ্বাসটা শব্দ করেই ছাড়ল ও। 'বুঝেছি। টাকা পাই আর না পাই, কাজটা আমাকে করে দিতেই হবে, এই তো?'

পাল্টা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল লেয়ার্ড। 'দেখো দেখি, টাকা দেব না এমন কথা কি আমি বলেছি একবারও?'

চুপ করে থাকল ও। 'চলুন,' উঠে পড়ল বিজ্ঞানী। 'চায়ের সময় হয়ে গেছে।' আগে আগে চলল। 'কাজটা শেষ করুন। অবশ্যই টাকা পাবেন।'

ডেস্কের ইষ্ক স্ট্যান্ডের পাশে পড়ে থাকা ছোট ছোট বল বিয়ারিঙ জুড়ে তৈরি রিঙের মত এক পেপারওয়েটের ওপর অনেকক্ষণ থেকেই চোখ আটকে ছিল রানার, ওঠার সময় সুযোগ বুঝে চট্ করে পকেটে চালান করে দিল জিনিসটা।

সাত

ডিনারের পর নিজের রূমে চলে এল রানা। সিদ্ধান্ত পাকা, আজ রাতেই ভাগবে। যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করা যায় না এখানে বসে। ছয় নিউক্লিয়ার এস্টাবলিশমেন্টের নাম মুখস্থ ওর, বাইরে গিয়ে ওগুলো মারভিন লংফেলোকে কোনমতে জানিয়ে দিলেই চলবে। হাতে সময় আছে, বিপদ ঘটে যাওয়ার আগে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারবেন তিনি, সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ওগুলোর কন্ট্রোল রূম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারবে তারা ঝটিকা অভিযান চালিয়ে। লেয়ার্ডের আর তার দুর্গের সম্ভাব্য পরিণতি তো ঠিক হয়েই আছে।

জুতোর হিলের খোপ থেকে লুকানো ছুরিটা বের করে পেপারওয়েটের খুদে বলগুলোর জোড়া খুলতে লেগে গেল ও। বিশেষ অসুবিধে হলো না, অ্যাডহেসিভ দিয়ে লাগানো ছিল, ছুরির ধারাল প্রান্তের সামান্য চাপ খেতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এক এক করে। মোট বারোটা বল—প্রয়োজনের চাইতে যথেষ্ট।

ওগুলো ট্রাউজারের পকেটে ভরে ব্রীফকেস গোছগাছ করে নিল রানা, তারপর উঠে পড়ল বিছানায়। শার্ট, প্যান্ট, জুতো, কিছুই খোলেনি। সিগারেট ধরিয়ে সময় পার করতে লাগল। সবাই ঘুমালে রোজালিন আসবে, খেতে বসে ইশারায় কথা

হয়েছে। তার অপেক্ষায় আছে। শুয়ে থেকে থেকে তন্দ্রামত এসে গিয়েছিল বলে উঠে পায়চারি শুরু করল একসময়।

অনেক দেরিতে, প্রায় একটার সময় এল মেয়েটি। দরজার লকের ভারী ক্লিক শব্দ শুনে দ্রুত সেদিকে এগোল রানা। এক হাতে দরজার পাল্লা ধরে অন্য হাত পকেটে ভরে কয়েকটা চকচকে বল বের করল। 'কি করছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রোজালিন।

'লেয়ার্ডের দরজার তালা পরীক্ষা করছি।' এই প্রথম দেখল ও, ফ্রেমে যেখানে তালার লিভার ঢুকে দরজার লকিং সিস্টেম 'অন' করে, সেই জায়গাটা স্টীলের। একটা নয়, তিনটে হাউজিং আছে ফ্রেমে—ওপরে, মাঝখানে ও নিচে। অর্থাৎ তিনটে লক। সিলিন্ড্রিক্যাল বোল্ট টাইপের, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তির সাহায্যে অ্যাকটিভেট হয়। যখন লক করা হয়, বোল্ট তিনটে যার যার হাউজিঙের শেষ মাথা পর্যন্ত সেঁধিয়ে যায়, ইলেক্ট্রিক সার্কিট কমপ্লিট হয় তখন।

সন্তুষ্ট হলো রানা, এরকম কিছুই আশা করছিল। প্রতিটা হাউজিঙে চারটে করে বল ভরে দিল ও, আঙুল দিয়ে যতদূর যায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। এতগুলোর দরকার ছিল না, তবু ভরল অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে। তারপর আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজা। বোল্টগুলোর নিজের নিজের হাউজিঙে ঢুকে পড়ার শব্দ শুনল ওরা আবছামত, তবে সেই ভারী 'ক্লিক' শোনা গেল না। সার্কিট পুরো করতে পারেনি ওগুলো বলের বাধার জন্যে, পারবেও না যতক্ষণ বের না করা হচ্ছে।

ব্যাপার টের পেয়ে মুচকে হাসল রোজালিন। এখনও ডিনারের পোশাক পরে আছে সে। এক হাতে ক্যালকুলেটরের মত কিছু একটা ধরে আছে, অন্য হাতে ডুয়েলিং পিস্তল। হলরুমের কাঁচের বক্স থেকে বের করে এনেছে নিশ্চই।

'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত, রানা,' বলল সে চাপা গলায়। 'লেয়ার্ড এইমাত্র শুতে গেল। পিটার আর তার সঙ্গীদের সাথে কি নিয়ে যেন কথা বলছিল এতক্ষণ, কিছু কিছু শুনেছি আমি।' চোখ বড় করে ওকে দেখল সে। 'রানা, লেয়ার্ড তোমাকে কোন কাজের প্রস্তাব দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'সর্বনাশ!' অস্ফুটে প্রায় গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি। 'যা ভেবেছিলাম! কাজটা শেষ হলে পিটার তোমাকে খুন করবে, রানা। লেয়ার্ড তাকে সে-অনুমতি দিয়েছে।'

হাসল ও মেয়েটিকে অভয় দেয়ার জন্যে। 'সে আমিও অনুমান করেছি, রোজ।'

'কি কাজ করতে দিয়েছে তোমাকে লেয়ার্ড? কতটা ভয়ঙ্কর?'

'এতই ভয়ঙ্কর, রোজ, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সারা বিকেল কোথায় ছিলে তোমরা? নিশ্চই সেই নিউক্লিয়ার···'

'ঠিকই ধরেছ তুমি। লেয়ার্ড তার প্ল্যান ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিল আমাকে।'

'ওহ্, গড!'

'শোনো, আমি পালাচ্ছি। ঘাবড়িয়ো না; সময়মত যেমন বলেছি, তোমাকে উদ্ধার করতে আসব আমি।'

পিস্তলটা ওকে দিল রোজালিন। 'এটা রাখো। বের হওয়ার সময় লাগতে

পারে।'

'ধন্যবাদ,' জিনিসটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল ও। 'ট্রিগার টিপলে আমার হাত উড়িয়ে দেবে না তো?'

'না, ঠিক আছে ওটা। লেয়ার্ড মাঝেমাঝে গুলি ছুঁড়ে মেকানিজম পরীক্ষা করে। কোন অসুবিধে নেই। বল, পাউডার সব লোড করাই আছে।'

জিনিসটা নিয়ে আসার জন্যে ওর বুদ্ধির তারিফ করল রানা মনে মনে। এ মুহূর্তে ও নিরস্ত্র, ওয়ালথার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে। বলা যায় না, ওই পর্যন্ত পৌঁছার আগে প্রয়োজন পড়তেও পারে এ জিনিসের। 'এটা কারটা?'

'মনরোর। যে জিতেছিল।'

'গুড! হারু পার্টির জিনিস নিয়ে কারও সাথে লড়তে চাই না।'

'এবার মন দিয়ে শোনো কি করে বেরুতে হবে। হলরুমের মেইনগেটের ডানদিকে, ওপরে একটা লাল সুইচ আছে। ওটার নিচে আছে আরেকটা ছোট সুইচ। প্রথমটা দরজা খোলার, পরেরটা দুর্গের অ্যালার্ম সিস্টেম অফ করার। প্রথমে ছোট সুইচ ওপরদিকে তুলে দেবে, তারপর লালটা টিপলেই দরজার লক্ খুলে যাবে। ওটা অন করার সাথে সাথে সুইচবোর্ডে লাল আলো জ্বলে উঠবে, সতর্ক হয়ে যাবে সবাই। কাজেই বেশি সময় পাবে না।

'দরজা খুলেই সোজা ছুটতে হবে তোমাকে। তোমার গাড়ি সামনেই আছে, খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। বুঝতে পেরেছ?' রানা মাথা দোলাতে অন্য জিনিসটা এগিয়ে দিল মেয়েটি। 'এটা মেইন গেটের রিমোট কন্ট্রোল। বেশি দূর থেকে না, গেটের একশো গজ দূর থেকে "ওপেন" লেখা সুইচটা টিপবে তুমি, কাজ হবে।'

'কার এটা?'

'মের। চুরি করে এনেছি।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রোজ। নিজের রূমে ফিরে যাও, আমি ঠিক তিন মিনিট পর বের হব। সব ঠিক থাকলে আবার ফিরে আসব আমি তোমার জন্যে, ভেবো না।'

কাছে এসে ওর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েটি, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'সাবধানে থেকো, রানা। সাবধানে যেয়ো।' চোখ বুজে মুখ এগিয়ে দিল ও। চুমু খেলো রানা। অনেকক্ষণ দুটো দেহ সেঁটে থাকল পরস্পরের সাথে। মুখ সরিয়ে নিল রোজালিন। চাপা কণ্ঠে আবার বলল, 'সাবধান থেকো!'

'চিন্তা কোরো না,' ওর বাহুতে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'যাও, নিজের ঘরে চলে যাও।'

যাই যাই করে আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল মেয়েটি, ওর দিকে তাকিয়ে হয়তো ভরসা খুঁজল। 'গুড বাই, রানা।'

'গুড বাই, রোজ।'

ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল সে বারবার পিছন ফিরে দেখতে দেখতে। নিঃশব্দে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, দরজা বন্ধ হয়ে যেতে কাজে লেগে পড়ল। রিমোট কন্ট্রোলটা হিপ পকেটে রেখে ডুয়েলিঙ পিস্তল কোমরে গুঁজল, হ্যামার ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে নিতে ভুলল না আগে। তারপর ব্রীফকেস থেকে

একটা ছোট, চৌকো বক্স বের করল, দেখতে অনেকটা ডানহিল সিগারেট প্যাকেটের মত জিনিসটা। ওটাও একটা রিমোট কন্ট্রোল। ওর গাড়ির।

ইগনিশন সিস্টেমের সাথে পেতে রাখা বোমার ঝুঁকি এড়াতে দূর থেকে ওটার সাহায্যে গাড়ি স্টার্ট দেয়ার ব্যবস্থা আছে ওর গাড়িতে। ব্রীফকেস, গাড়ির চাবি আর রিমোট কন্ট্রোল, সব বাঁ হাতে নিল রানা। ডান হাত সম্ভাব্য অ্যাকশনের জন্যে মুক্ত। লম্বা করে দম নিল কয়েকবার, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রুম থেকে। দরজা আস্তে করে ভিড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। চোখ সয়ে আসতে পা বাড়াল গ্যালারির দিকে। সিঁড়িতে লো ওয়াটের একটামাত্র সেফটি ল্যাম্প। তাতে অন্ধকার দূর তো হয়ইনি, বরং আরও যেন চেপে বসেছে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে থামল রানা। পুরানো দুর্গ দু'বার বিচিত্র শব্দ করল। কান খাড়া করে আওয়াজটা বোঝার চেষ্টা করল ও—দুর্গেরই তো? হ্যাঁ, তাই। আবার এগোল। সিঁড়িতে পা রাখার আগে নিচের হলরুম আর গ্যালারির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল। তারপর নিশ্চিন্তমনে দেয়াল ঘেঁষে নামতে শুরু করল। হলরুমে পা রেখে দ্রুত এগোবার স্বাভাবিক তাগিদ প্রতিরোধ করতে মনের জোর খাটাতে হলো ওকে। পা দুটো নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইছে না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চাইছে।

ধীর পায়ে রয়ে-সয়ে মেইন ডোরের দিকে এগোল রানা। টিপে টিপে। সুইচ দুটো যথাস্থানে দেখতে পেল। লালটা অন্ধকারে জ্বলছে অল্প অল্প। কাছে গিয়ে প্রথমে অ্যালার্ম সিস্টেম অফ করল ও খুদে লিভার ওপরে ঠেলে দিয়ে, তারপর দুরু দুরু বুকে টিপে দিল লালটা। পরক্ষণে চমকে উঠল নিজেই। হাউজিং থেকে একযোগে বেরিয়ে এল তিন হেভি সিলিন্ড্রিকাল বোল্ট, আওয়াজটা হলো প্রায় গুলি ফোটার মত। অখণ্ড নীরবতার মাঝে এত বিকট আওয়াজে মরাও বুঝি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মনে হলো রানার। খুলে যেতে শুরু করেছে দরজা, নাকে এসে লাগছে বাগানের হরেক রকম ফুলের মিলিত সুগন্ধ, তখনই আরেক দফা ওকে চমকে দিয়ে পুরো হলরুম আলোকিত হয়ে উঠল।

'হ্যান্ডস আপ!' গুরুগম্ভীর একটা নির্দেশ ভেসে এল পিছন থেকে। গলাটা নিঃশব্দচারী বাটলার হ্যারির, শুনেই বুঝল ও। অনুমান করল সিঁড়ির গোড়ায় কোথাও আছে লোকটা। থমকে গেল রানা।

ভান করল আস্তেই ঘুরছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘুরল বিদ্যুৎগতিতে, হাতে বেরিয়ে এসেছে ডুয়েলিঙ পিস্তল। যে মুহূর্তে ঘোরা শেষ হলো, অষ্টকোণ ব্যারেলটাও প্রয়োজনীয় বুক সমান উচ্চতায় স্থির হলো। গুলি করল রানা। হাতের মধ্যে বন্দী সাপের মত লাফ মেরে উঠল ওটা বিকট শব্দের সাথে, সাদা ধোঁয়ায় মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হয়নি ওর, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর ট্রেনিঙ পাওয়া কান গলাটা কোনখান থেকে এসেছে, সনাক্ত করেছিল ঠিকমতই।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল হ্যারি, পরমুহূর্তে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠল মেঝেতে, হাতের অস্ত্র পড়ে গেছে। পুরো একটা চক্কর খেয়ে দড়াম করে আছড়ে

পড়ল লোকটা পাকা মেঝের ওপর। দেড় শতাব্দীরও পুরানো বল বুলেটের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে কাঁধের হাড়।

ছবিটা পুরো দেখা হলো না রানার—সময় নেই। এক লাফে বাইরে চলে এল, ঝেড়ে দৌড় লাগাল গাড়ির দিকে। চোখের কোণ দিয়ে সামনের বাগানে কয়েকটা নড়াচড়া দেখতে পেল ও। কারা যেন ছুটে আসছে! রিমোট কন্ট্রোল টিপে দিল রানা, গজ বিশেক সামনে সগর্জনে স্টার্ট নিল স্যাব ৯০০ টার্বো। আওয়াজটা কানে যেতে ও-ও যেন নতুন উদ্যম পেল, ছুটল তুমুলবেগে। বাগানের ছায়াগুলো ততক্ষণে ঘুরে গেছে, দুর্গ ছেড়ে গাড়ির দিকে আসছে। সামনের ছায়াটা দানবাকৃতি—পিটারের!

ডোর লক স্লটে চাবি ভরে মোচড় দিল রানা, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ব্রীফকেসটা পিছনের সীটে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। পিছন থেকে পিটার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তখন সঙ্গী-সাথী নিয়ে। ঘাবড়াল না ও, বুলেটপ্রুফ কার, সহজে কিছু করতে পারবে না ব্যাটারা। ব্যস্ত হাতে ড্যাশবোর্ড থেকে অতিরিক্ত নাইটফাইন্ডারজোড়া বের করে পরে নিল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে গিয়ার এনগেজ করেই ব্রেক রিলিজ করল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সামনেই মেশিন পিস্তল হাতে পিটারকে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। হাঁপাচ্ছে। মুখে কলজে হিম করা বিকট হাসি। দু'হাতে অস্ত্র ধরে রেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কি যেন বলল সে, দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে গাড়ি থেকে বের হতে নির্দেশ দিল। মুখ ঘুরিয়ে দু'পাশে লেয়ার্ডের আরও চার চ্যালাকে দেখতে পেল রানা, ফ্রেঞ্চ-কাট নিক আর হ্যারিও আছে তাদের মধ্যে। একই অস্ত্র সবার হাতে, রানার মাথা সই করে ধরে আছে ব্যাটারা।

সামনে নজর দিল রানা। পিটারের অগ্নিশর্মা, খেপাটে মুখের দিকে তাকাতে আবার দাঁত খিঁচাল সে। 'সরি, বন্ধু,' বলল রানা। 'আজ সময় নেই, পরে আলাপ হবে।' এক্সিলারেটরে চাপ দিল হাত নেড়ে নীরবে পিটারকে টা টা করে। লাফ দিল স্যাব, খুব দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে ডান ফেন্ডার দিয়ে মাঝারি একটা গুঁতো মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিল ও পিটারকে, তারপর ছুটল।

পিছন থেকে গুলি করল লোকগুলো, স্যাবের মজবুত আর্মার প্লেটিঙ মোড়া দেহে ঠক-ঠক্ করে লেগে ছিটকে পড়ল প্রতিটা বুলেট, কয়েকটা পিছনের কাঁচেও লাগল। পিছলে এদিক-ওদিক ছুটে গেল। রিয়ার ভিউ মিররে দানবটাকে উরু চেপে ধরে পথের ওপর গড়াগড়ি খেতে দেখল রানা মুহূর্তের জন্যে। বাঁক ঘুরে মেইন ড্রাইভওয়েতে উঠতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পিছনে সমানে গুলি ছুঁড়ছে অন্যরা, স্যাবের গায়ে অনবরত মাথা কুটছে বুলেটগুলো।

হিপ পকেট থেকে এক টানে রোজালিনের দেয়া মেইন গেটের রিমোট কন্ট্রোলটা বের করে কোলের ওপর রাখল রানা, নির্ভয়ে কাঁচ নামিয়ে দিল। আচমকা একটা ফট্ শব্দের সাথে দুলে উঠল স্যাব, মুহূর্তখানেক টলোমলো করে সোজা হয়ে গেল আবার। বুঝল রানা কি ঘটেছে—পিছনের এক টায়ারে গুলি লেগেছিল। কিন্তু ডানলপ ডেনোভোস টায়ারের জন্যে তাতেও সুবিধে হয়নি ব্যাটাদের, পাংচার ও স্প্লিট-প্রুফ মাল, উল্টে ওটাকেই বেমালুম হজম করে

ফেলেছে।

একটুপর ভারী লোহার মেইন গেটের দেখা পেতে মন খুশি হয়ে উঠল ওর। থার্ড গিয়ার দিল। এসে পড়েছে গেট, চট করে রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে জানালা দিয়ে হাত বের করে ওপেন' সুইচ টিপে দিল। যদিও এর মধ্যে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, জিনিসটা হয়তো কাজ করবে না। জানাজানি হয়ে গেছে ওর পালানোর খবর, কাজেই সুইচবোর্ড কন্ট্রোল হয়তো অফ করে দিয়েছে গেটের লাইন।

মুহূর্তের জন্যে রোজালিনের ব্যাপারেও সন্দেহ জাগল রানার। ওকে ইচ্ছে করে ফাঁদে ফেলেনি তো মেয়েটা? নইলে এত রাতে লোকগুলোর প্রায় রেডি অবস্থায় থাকার তো কথা নয়! এটা কোন সেট-আপ নয়তো? ভাবতে ভাবতেই মন খুশি হয়ে উঠল গেটটা নড়ে উঠেছে দেখে। এক পাল্লার গেট, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে ওর বাঁয়ে। গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা।

তখনই একটা কাঠামো দেখতে পেল, ডানদিকের গার্ড পোস্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে, ডান হাত বেশ দীর্ঘ তার। ওপরে উঠল হাতটা, হলুদ ফুল্‌কি উদ্গিরণ করতে লাগল। জানালার কাঁচ তুলে দিল রানা, পাল্টা গুলি ছোঁড়ার কোন আগ্রহ দেখা গেল না ওর মধ্যে। অহেতুক রক্তপাত পছন্দ নয়। করতে থাক ব্যাটা যত খুশি গুলি, ভাবতে ভাবতে তুফান বেগে স্যাব ছোটাল রানা।

গেট এখনও খুলছে। গতি এত ধীর যে শঙ্কিত না হয়ে পারল না ও, ভয় হলো প্রয়োজনের সময় বেরিয়ে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি হবে কি না ভেবে। আহাম্মক গাডের নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা, এসে পড়েছে গেট। একদিকের পিলার আর গেটের প্রান্তের মাঝের ফাঁক হিসেব করে হুইল ঘোরাল ও, পিছনে ধুপ্ ধাপ শব্দে আছড়ে পড়ছে বুলেট। সাঁ করে মাথার ওপর এসে হাজির হলো গেট।

উন্মুক্ত জায়গা দিয়ে নাক ভরে দিল ও। পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল স্যাব-দু'পাশেই ঘষা খেয়েছে। মুহূর্তের জন্যে গতি কমে গেল, বিকট শব্দে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত বডি দুবড়ে, চিরে গেল। হোঁচট খেতে খেতে এগোল স্যাব, তারপর মুক্ত হয়েই গা ঝাড়া দিয়ে ফের ছুটল ঘণ্টায় ৮৫ মাইল বেগে। তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত ভাগছে লেজ দাবিয়ে।

মোটামুটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল ও, এমন সময় চোখ পড়ল পিছনের আলোটার ওপর। তেড়ে আসছে পিটার দলবল নিয়ে। গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক চিন্তা জুড়ে বসল মাথায়। গ্রাম থার হতে পারবে নিরাপদে? পথে কি বাধা দেয়া হবে ওকে? বলা যায় না, হতেও পারে। হয়তো খবর পেয়ে এতক্ষণে ওখানে তৈরি হয়েই আছে কোন' অভ্যর্থনা কমিটি। তবে ভরসাও একটা আছে, হেড লাইট অফ করে ছুটছে রানা, তারওপর গতিও তেমনি, হয়তো সময়মত ওকে লোকেট করতে পারবে না ব্যাটারা।

পিছনের গাড়ি মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারেনি দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা। একই দূরত্বে আছে। গির্জার কাছে পৌঁছে হঠাৎ করে মত পাল্টাল ও, খুব দ্রুত স্টিয়ারিঙ হুইল ঘুরিয়ে শিলডিগের পথ ধরল। শেষ মুহূর্তে মারকান্ডি ঢোকার

মুখের কাঠের ব্রিজটার ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে। ওটা ড্র ব্রিজ কি না কে জানে? হয়তো জায়গামত পৌঁছে শেষ মুহূর্তে দেখা যাবে তাই, জায়গা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে। শিলডিগের রাস্তা অন্যটার মত মসৃণ নয়, বেদম লাফাচ্ছে গাড়ি। কয়েকবার ছাতে ঠুকে গেল মাথা। তবু গতি কমানোর কথা ভাবল না পর্যন্ত ও। অন্ধকারে যত তাড়াতাড়ি মারকান্তি থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

ভাবতে না ভাবতে ওর আশা-ভরসার গালে প্রচণ্ড এক চড় পড়ল। কাছেই কোথাও থেকে আকাশে উঠল কয়েকটা ফ্লেয়ার! একটুপরই শূন্যে ফুলঝুরির মত বিস্ফোরিত হলো ওগুলো, তীব্র নীলচে আলোয় দিনের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারদিক। দিনে দুপুরে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যেন ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন অনুভূতি হলো রানার। পিছনে কোথাও গর্জে উঠল অসংখ্য অটোম্যাটিক অস্ত্র।

গতি কমাবার ফাঁকে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল ও। যে রিসেপশন কমিটির ভয় করছিল, এরা নিশ্চই সেই দলের। মুঠো থেকে শত্রু বেরিয়ে গেছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠেছে, খুঁজছে হন্যে হয়ে। মাথার ওপর তিনটে ফ্লেয়ার ঝুলছে, হেলেদুলে নেমে আসছে। আচমকা ব্রেক কষল রানা, থাবা দিয়ে ওয়ালথার বের করেই ওপরদিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ব্যস্ত হয়ে নয়, ধীরেসুস্থে। চেম্বার খালি হয়ে গেল দুটো নেভাতে, অন্যটা পারা গেল না বেশি দূরে বলে। শূন্য ম্যাগাজিন ফেলে অতিরিক্তটা চেম্বারে ভরল রানা, ওটা পাশে রেখে আবার ছোটাল গাড়ি। অজ্ঞাত কারণে পিছনের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যে। পিছনের গাড়িটাও আর দেখা যাচ্ছে না, কেন, তাও ভেবে পেল না।

খানিকটা পথ নিরাপদে এগোল। তারপরই আবার বাধা, চার পাঁচটা ফ্লেয়ার একযোগে জ্বলে উঠল আকাশে। ততক্ষণে প্রায় সাইমুর ক্যাসেলের বরাবর পৌঁছে গেছে ও। ফ্লেয়ারের আলোয় নতুন একটা জিনিস দেখে আঁতকে উঠল—ওগুলো ট্রেসার! শূন্যে বাঁক খেয়ে ছুটে আসছে স্যাবের দিকে। অলস গতিতে। দ্রুত ওয়ালথার তুলে নিয়ে ব্রেক কষল ও, গুলি করে ফেলে দিতে হবে ওগুলোকে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। স্যারের বেশ পিছনে রাস্তায় পড়ল সব ক'টা।

গিয়ার দিয়ে এগোল রানা, ওদের আওতার বাইরে চলে এসেছে ভেবে খুশি। গতি বাড়াতে শুরু করল, ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলল। মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটাবার সময় দুর্গের দিকে তাকাল একবার—অন্ধকার এক ভৌতিক কাঠামোর মত দাঁড়িয়ে আছে ওটা। পিছনে ধাওয়াকারীদের খবর নেই। ওরা কেন থেমে গেল বোঝা যাচ্ছে না। এরমধ্যেই আশা ছেড়ে দিয়েছে? মনে হয় না।

কারণ যা-ই হোক, তাড়া করা বন্ধ হয়েছে ভেবে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল মনে, প্রতিমুহূর্তে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে থাকল ওর একটু একটু করে। লাফঝাঁপ কমে আসছে বুঝতে পেরে গতি বাড়াল স্যাবের, আগের তুলনায় যথেষ্ট মসৃণ এখন রাস্তা। গিয়ার বদলে টপে নিয়ে এল, মোটরওয়ের দূরত্ব বোঝার জন্য ম্যাপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে জমে গেল শেষ মুহূর্তে। চট্ করে কপাল কুঁচকে উঠল, কেমন একটা আওয়াজ আসছে না? কিসের?

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ বোলাল রানা—নেই কিছু, রাস্তা ফাঁকা। তাহলে?

অবশ্য সমস্যা একটা আসছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু সেটা কি? দ্বিধায় পড়ে গতি কমিয়ে দিল ও অজান্তেই, বোকার মত শত্রুর অপ্রত্যাশিত কোন ফাঁদে পড়ার ইচ্ছে নেই।

এমন সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল। যে পথে ও চলেছে, পাহাড় চূড়ার পাশ দিয়ে বাঁক খেয়ে শিলভিগের দিকে নেমে গেছে সেটা। সামনেই রাস্তার সর্বোচ্চ পয়েন্ট, দু'মিনিট লাগবে স্যাবের ও পর্যন্ত পৌঁছতে–কিন্তু সুযোগটা যে পাওয়া যাবে না, ওটাকে দেখার এক সেকেন্ড আগেও ভাবেনি রানা। দেহের সমস্ত পেশী টান্ টান্ হয়ে উঠল।

চূড়োর ওপাশ থেকে স্লো মোশন ছায়াছবির মত ধীরগতিতে প্রথমে মাথা জাগাল ঘূর্ণায়মান রোটর, তারপর প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত বিশাল একটা কপ্টার। চুঁই-চুঁই চুঁই-চুঁই শব্দে বাতাস কাটছে। মুহূর্তের জন্যে আহাম্মক বনে গেল ও, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। পরক্ষণে তীব্র এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো, দাঁড়িয়েই গেল প্রায় ব্রেকের ওপর। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে যন্ত্র দানবটার দিকে।

এই জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, ওটাকে দেখার আগপর্যন্ত ভুলেও একবার মাথায় আসেনি। আরগুয়েলোকে রেখে কপ্টার কখন ফিরে এসেছে, টেরই পায়নি রানা। এর জন্যেই যে ধাওয়া করা বন্ধ হয়ে গেছে, এইবার বুঝল। স্যাবের নাকের প্রায় সামনে ভেসে আছে ওটা, ককপিটে পাইলটের পাশে স্বয়ং লেয়ার্ড বসা। পাইলটের চোখে ওরই নাইটফাইন্ডার।

কড়া ব্রেক কষার ফলে ঘুরে যেতে শুরু করেছে স্যাব, দাঁড়িয়েই পড়েছে প্রায়, তখনই খেয়াল হলো ভুল করছে ও, এরকম সময় থেমে পড়া বোকামি। হুইলের সাথে কুস্তি শুরু করে দিল রানা, গাড়ি সোজা করে আবার ছুটল, ডান হাত ওয়ালথারসহ বের করে দিয়েছে জানালা দিয়ে। ব্যারেল ওপরমুখো করে পর পর দুটো গুলি করল ও, কিছুই ঘটল না, বরং আরও বিপজ্জনক নিচে নেমে এল কপ্টার। স্যাবের সাথে তাল রেখে পিছু হটছে।

আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা, তবে একটু দেরিতে। তার এক সেকেন্ড আগেই সাঁই-সাঁই করে ওপরে উঠে যেতে শুরু করেছে যন্ত্র ফড়িঙ। পরমুহূর্তে স্যাবের দশ গজ সামনের রাস্তা লাফ দিয়ে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায়। স্টান গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে কপ্টার থেকে। আবার হুইলের সাথে কুস্তি শুরু করল রানা, বিস্ফোরণের জায়গাটাকে পাশ কাটাবার সংগ্রাম করছে। এর মধ্যে ওর পিছনে চলে গেছে কপ্টার।

সামলে ওঠার আগেই পর পর আরও দুটো গ্রেনেড পড়ল স্যাবের একেবারে সামনে। ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা অনুভব করল রানা, পরক্ষণে মাথা তুলতে শুরু করল গাড়ি। শূন্যে উঠে গেছে সামনের দুই চাকা। উঠছে, আরও উঠছে, ভেতরে বসে রানা অসহায়ের মত উত্থান দেখছে ওটার। কিছু করার নেই।

দেখতে দেখতে একদম খাড়া হয়ে গেল স্যাব টার্বো, তারপর উল্টে যেতে শুরু করল পাশের অগভীর খাদের দিকে। মরিয়া এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে সীট বেল্টের বাঁধন মুক্ত করল রানা। বুঝে ফেলেছে কি ঘটতে যাচ্ছে। সময় নেই।

এখনই সতর্ক করতে হবে মারভিন লংফেলোকে। ড্যাশবোর্ডে দুই পা বাধিয়ে, এক হাতে সীটের ব্যাক আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য-রক্ষার লড়াইয়ের ফাঁকে বুক পকেট থেকে সিগন্যাল পেনটা বের করার জন্যে হাত বাড়াল ও। থমকে গেল পরমুহূর্তে। নেই ওটা!

অথচ পরিষ্কার মনে আছে রানার, দুর্গ থেকে বের হওয়ার সময় ওখানেই রেখেছে জিনিসটা। কোথায় পড়ল? ভাবনাটা পুরো শেষ করতে পারল না ও, সবেগে রুফ দিয়ে আছড়ে পড়েই আবার নাকের ওপর ভর দিয়ে খাড়া হতে শুরু করেছে স্যাব। দ্বিতীয় আছাড়ের ফল দেখার সুযোগ হলো না, পাশে পড়ে থাকা ওয়ালথার এখানে-ওখানে বাড়ি খেয়ে ঠকাশ করে আছড়ে পড়ল ওর কপালের পাশে।

ব্যথা তেমন অনুভব করল না রানা। জ্ঞান হারাবার আগে মনে হলো কচুকুচে কালো বালির সাগরে পড়েছে বুঝি ও। তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

আট

চোখ ধাঁধানো আলো। তীব্র, সাদা। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো এখনও গাড়ির মধ্যেই আছে ও, ঘনঘন ডিগবাজি খাচ্ছে। আশেপাশে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করছে।

বন্ধ পাতার মধ্যে মণি কয়েকবার ঘুরল, প্রায় জোর করেই চোখ খুলল ও। মুখের ওপর আরেকটা মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো—মে হরোইৎজ। হাসছে। 'কেন এমন একটা কাণ্ড ঘটালেন?' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'পনেরো ফিট গভীর খাদে পড়ে গিয়েছিলেন আপনি, জানেন? অক্সি-অ্যাসিটিলিন কাটার দিয়ে গাড়ি কেটে বের করতে হয়েছে আপনাকে। না না, ঘাবড়াবেন না, তেমন কিছু হয়নি। এখানে-ওখানে সামান্য কেটে ছড়ে গেছে কেবল। ভয় নেই।'

উঠে বসার চেষ্টা করে বাধা পেল ও, হার্নেস দিয়ে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে শক্ত করে। নাকে কড়া ওষুধের গন্ধ আসছে। পাশে তাকাল, সাদা টাইলের দেয়াল দেখে বুঝে ফেলল কোথায় আছে। লেয়ার্ডের টর্চার চেম্বার।

অপারেটিঙ টেবিলের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। গায়ে কোট নেই। পাশেই দাঁড়িয়ে মে. হরোইৎজ, পরনে সাদা কোট। ডাক্তারের বেশ। পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল মেয়েটি ট্রেইনড ফিজিশিয়ান। তার পাশে লেয়ার্ডের দুই পোষা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। একটা ফ্রেঞ্চ-কাট নিক, অন্যটাকে ও চেনে না। পাথর দিয়ে তৈরি যেন ব্যাটাদের মুখ, কোন অভিব্যক্তিই নেই ওখানে।

'ভয় নেই যখন,' সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল ও। 'বেঁধে রাখা হয়েছে কেন আমাকে?'

রজার সাইমুরের মৃদু গলা ভেসে এল জবাবে। 'কথা নেই বার্তা নেই যা ঘটিয়ে বসলেন, তার ব্যাখ্যা জানার জন্যে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'ব্যাখ্যা!' আকাশ থেকে পড়ল ও। 'কিসের? আপনি বলতে চাইছেন এখানে কাউকে নাইটরাইডে যেতে হলেও আগে নোটিশ দিতে হবে?'

'ভারি রসিক মানুষ তো সাহেব আপনি!' বলল সে। 'আমার কর্মচারীকে খুন করলেন, গোপনে ক্যাসেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, নাইটরাইডের জন্যে? তা বেশ! কিন্তু মাথার মধ্যে আমার বর্তমান প্রজেক্টের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ভরে আপনি গভীর রাতে সো কল্ড্ রাইডে যাবেন, আর আমি তা চুপ করে দেখব, কি করে ভাবলেন?' আফ্‌সোস প্রকাশ করল বিজ্ঞানী মাথা দুলিয়ে। 'মানুষটা আপনি মোটেই বিশ্বস্ত নন। তাই আপনার-আমার মৌখিক চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি। এখন আমাকে জানতে হবে আপনি আসলে কে, কার হয়ে কাজ করছেন, এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য আপনার ছিল কি না। তবে আপনার শেষ পরিণতি যে পরপারে যাওয়া, সে ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ পুষে রাখবেন না যেন। কনফার্ম টিকেট হয়ে গেছে, যেতেই হবে আপনাকে। এবার বলবেন কি দয়া করে, কে আপনি? সত্যিকার পরিচয় কি আপনার?'

মাথার ভেতরের ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গেছে রানার এতক্ষণে। দৃষ্টিও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সব মনে পড়ছে। এখন কি ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করতে দেরি হলো না। হাত-পায়ের আঙুল নেড়েচেড়ে দেখল ঠিকই আছে সব, হাড়গোড় ভাঙেনি কোথাও। এখানে-ওখানে সামান্য কেটে ছড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছুই ঘটেনি। শুধু কপালের পাশে ওয়ালথারের বাড়ি খাওয়া জায়গাটায় যা একটু

'কে আপনি, মিস্টার রানা?'

'আপনি ভালই জানেন আমি কে,' রেগে ওঠার ভান করল ও।

লেয়ার্ডকে চিন্তিত দেখাল। 'আমি যা জেনেছি, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনার এমন এক কাণ্ড ঘটানোর কোন কারণ দেখি না। আমার কাজ করে দেয়ার চুক্তিতে রাজি হলেন, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাসেল ছেড়ে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা, কেন?'

'ভয়ে,' গলা স্বাভাবিক রেখে বলল ও।

'ভয়ে!'

'হ্যাঁ, ভয় ছিল কাজটা আমি করতে পারব না, ব্যর্থ হব, তাই।'

'হবে হয়তো,' পাখি-নড করল লেয়ার্ড। 'কিন্তু আমি শিওর হতে চাই, মিস্টার রানা। ভেতরের আসল কথা জানতে চাই। এবং তাড়াতাড়ি, হাতে সময় নেই। আমার বান্ধবী মে আমাকে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে। আপনি জানেন না ও ট্রেইনড ফিজিশিয়ান। সাইকিয়াট্রিস্ট। প্রয়োজনে আপনার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারবে এসব করতাম না, করছি বাধ্য হয়ে। এরমধ্যে আপনার লাগেজ চেক করেছি আমি। যা পেয়েছি, একজন মার্সেনারির জন্যে সে সব একটু বেশি সফিস্টিকেটেড। ভেরি ইন্টারেস্টিং। মে! এঁর পেটের ভেতর আরও কোন কথা আছে কি না জানতে হবে। শুরু করো।'

আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা মেকে ওর শার্টের হাতা গোটাতে দেখে, স্ট্র্যাপের বাঁধন অগ্রাহ্য করে উঠে বসার চেষ্টা করল মরিয়া হয়ে। লাভ তো হলোই না, বরং ওগুলো আরও চেপে বসল। বাইসেপের একটু নিচে ভেজা, ঠাণ্ডা কিছুর ছোঁয়া

অনুভব করল ও পরক্ষণে। ইঞ্জেকশন পুশ করতে যাচ্ছে মে। চেহারা-চাউনি এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে তার।

কি পুশ করতে যাচ্ছে মেয়েটি, কনভেনশনাল কোন ট্রুথ ড্রাগ? না আনকনভেনশনাল? সতর্ক থেকো রানা, নিজেকে শোনাল ও, মারভিন লংফেলোর তৈরি নিজের বর্তমান ডোশিয়ের ওপর মনের চোখ স্থির করল। সাবধান! বেফাঁস কিছু বলে বোসো না যেন। বাহুতে কুট্ করে হাইপোডারমিক নীড্‌ল ঢুকে গেল, মুখ বিকৃত করল রানা। কি ওটা? সার্ভিসে যাকে সোপ বা সাবান বলা হয়, সেই সোডিয়াম থাইওপেন্টাল? না আরও শক্তিশালী কোন টক্সিক ড্রাগ? অথবা স্কোপোলামাইনের সাথে মরফিনের মিশ্রণ?

আসল দিকে মন দাও, আহাম্মক কোথাকার! ডোশিয়ের পাতা ওল্টাতে থাকো মনে মনে, যেন সময়মত উল্টোপাল্টা কিছু বেরিয়ে না যায় মুখ থেকে। আলসেমি কোরো না, পাতা ওল্টাও। খেয়াল রেখো, তুমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশী, এক্স মেজর, নম্বর ৭২৫০৯৫। তোমার বর্তমান পেশা…

হাত টেনে নিল মে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল সেই মনকাড়া হাসি। প্রায় একই মুহূর্তে রানা টের পেল, দেহ থেকে মনটা ওর স্বাধীন হয়ে গেছে যেন, ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে বাতাসে। ধীর গতিতে ঘুরছে চোখের সামনে।

একটু পরই মনে হলো গ্রীষ্মের শেষ বিকেলে ফুলে ফুলে ভরা বাগানে হাঁটছে ও। সুন্দর ছায়াঢাকা পরিবেশ, ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর-মন জুড়িয়ে যাচ্ছে, নাকে আসছে নাম না জানা নানান ফুলের গন্ধ। রোজালিন রয়েছে সাথে—পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছে দু'জনে… শিশুরা হাসছে…ফোয়ারার পানিতে খেলা করছে হাঁস…কাছেই কোথাও…

হঠাৎ করে চেহারার সমস্ত কমনীয়তা উবে গেল রোজালিনের। মৃদু তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'রানা, তোমার সত্যিকার পেশা কি?'

জোর করে মনটাকে দেহের খাঁচায় বন্দী করতে চাইল ও। জানে মেয়েটাকে বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না, তবু বলল, 'মার্সেনারি।'

'তোমার আসল পরিচয়?'

'মাসুদ রানা। মেজর, রিটায়ার্ড। ৭২৫০৯৫।'

'আহ্, ওসব নয়, ডার্লিঙ। আমি তোমার সত্যি পরিচয় জানতে চেয়েছি।'

হঠাৎ করে রোজালিন মে হয়ে গেল। ঢুলুঢুলু চোখে তাকে দেখল ও। 'আমি মার্সেনারি। লেয়ার্ড…একটা কাজ দিয়েছে, আরগুয়েলোকে খুন করার। তারপর…তারপর ছয়টা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে…' মনটা বেরিয়ে যেতে চাইছে ফের। বেরিয়ে গেছে। ওটাকে ক্যাচ্ ধরার জন্যে হাত বাড়াল রানা, হলো না। পিপ করে গেছে।

'তারপর?'

'ইউরেনিয়াম আইসোটোপ…ইউ-টু থার্টি ফাইভ, আর আছে রিঅ্যাক্টর কোর। ইউরেনিয়াম ফুয়েল রড… চেইন রিঅ্যাকশন… মেল্টডাউন…'

'তুমি আবোল-তাবোল বকছ, রানা,' অসন্তুষ্ট হলো যেন রোজালিন। 'এসব তোমাকে শিখিয়েছে, তোমার মা, না ন্যানি? কেন সত্যি পরিচয়টা জানতে দিচ্ছ না

আমাদের?'

চালিয়ে যাও, রানা, কে যেন বলে উঠল ওর ভেতর থেকে। লড়াই চালিয়ে যাও। খবরদার, হার মানলেই কিন্তু সব শেষ। ভয়ঙ্কর মৃত্যু! 'বলছি তো, তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কি করব?'

'রাগ কোরো না, ডার্লিঙ! আরেকবার বলো, প্লীজ!'

'আমি মাসুদ রানা,' গলা বুজে এল ওর। 'বাংলাদেশী। মেজর, রিটায়ার্ড। বীরউত্তম। নম্বর···'

মৃদু শব্দ করে হাসল মেয়েটি। 'তুমি আসলে কোন নিউক্লিয়ার পাওয়ারের সঙ্গে জড়িত, তাই না? কোনটার সাথে, অ্যাটমিক রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন, নাকি ভিয়েনার অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি, কোনটার সাথে?'

চিন্তা করো, রানা। ভালমত ভেবেচিন্তে উত্তর দাও, নইলে কিন্তু ফেঁসে যাবে। স্বপ্নে নয়, জেগে উঠে কথা বলো। সাইমুর কি কি বলেছিল মনে করার চেষ্টা চালিয়ে যাও। লড়াই করো। 'জুয়ো খেলে অনেক টাকা দেনা হয়ে গেল, শোধ করতে না পারলে ওরা মেরে ফেলবে, তাই···পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় এক···এক বুড়ো হাবড়া তার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিল···'

'আবার সেই ফালতু কথা?' খেপে উঠল রোজালিন। গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'কে তুমি?'

'আমি···' না, রোজালিন তো নয়! ও আর কেউ। অথচ নাকে রোজালিনের মিলি ডি প্যাটোর চমৎকার মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে রানা। তাহলে কে ও? বুঝেছি। ডাক্তারনী মেয়েটা, কি যেন নাম? ও হ্যাঁ, মে।

অন্ধকার এক টানেল ধরে ভেসে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল ও। 'রানা! আমি মাসুদ রানা। মেজর, রিটায়ার্ড! কানে তুলো দিয়ে রেখেছ নাকি, শুনতে পাও না?'

'মেইন গেটের রিমোট কন্ট্রোল কে দিয়েছিল তোমাকে?' একটু নরম হলো গলাটা। 'ক্যাসেলের অ্যালার্ম সিস্টেম, লকিঙ সিস্টেম, এসব ভেতরের কথা তুমি জানলে কি করে, কে বলেছে?'

এবার মুখে তালা মারা উচিত, ভাবল রানা, কথা বেশি বলা ঠিক হচ্ছে না। অনিশ্চিত মেঘের মত ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়।

'কে বলেছে?' একটা পুরুষ কণ্ঠ। নিশ্চই লেয়ার্ড হারামজাদা।

রানা নিরুত্তর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, যেন বুঝতে পারছে না।

'কে, রোজালিন?'

উত্তর নেই। পরিস্থিতি কিছুটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এসেছে মনে হলো রানার। চোখের ঝাপসা ভাব কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। লেয়ার্ড আর মেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। 'ও পুরো কাবু হয়নি,' সাইমুরকে রেগেমেগে বলতে শুনল ও। 'ডোজ বাড়াও!'

'সেটা ঠিক হবে না,' মাথা দোলাল মে। 'মরে যেতে পারে।'

'তাহলে আর কিছু করো!'

খানিক সব চুপচাপ। সাড়া নেই কোন। তারপর, মনে হলো হঠাৎ করেই

কিছুটা সামনে ঝুঁকল যেন রানার দেহ, অদৃশ্য এক ঢাল বেয়ে নিচের দিকে রওনা হলো ও। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে গতি, ওর মধ্যেই দুই কানে চাপ অনুভব করল–হেডফোন! মিউজিক বাজছে। মধুর সুরের তরল মিউজিক পতনের গতি কমিয়ে দিল রানার, শীতল পানির মত গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আহ্, কী আরাম! ঘুম পাচ্ছে। কেমন হয় একটা ঘুম দিলে? কেমন আবার, ভালই তো হয়! ভীষণ ক্লান্ত ও, কিছু সময় ঘুমিয়ে নিলে···হঠাৎ একটা গলা বাঁ হাত ঢোকাল ওর চিন্তায়। 'মাসুদ রানা!' পুরুষের গলা।

'কি?'

'এখানে কেন এসেছ তুমি?'

'বেড়াতে। অ্যাসকটে···'

'আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, বাজে বকে লাভ হবে না, বুঝতে পেরেছ? সত্যি বললে বেঁচে যাবে তুমি। বলো!'

'সত্যিই বলছি। আমি মেজর মাসুদ রানা, রিটায়ার্ড। নম্বর···'

আচমকা মিউজিকের ভলিউম খুব বেশি বেড়ে যেতে চিৎকার করে উঠল ও অসহ্য, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়। মনে হলো আস্ত ঘিলু গলে পানি হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে বুঝি। ভয়ঙ্কর, পাগল করা আওয়াজ–উন্মত্তের মত লাফালাফি শুরু করে দিল রানা। অসহ্য, অসহ্য! ড্রাম বিট্, অজানা যন্ত্রের সুতীক্ষ্ণ কিঁচ-কিঁচ আর গিটারের উদ্দাম বাদন গরম লোহার স্পোকের মত, একদিক দিয়ে মগজ ছেঁদা করে ঢুকে মাথার অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বারবার।

তবে ভাগ্য ভাল যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল মিউজিক। কাউন্টার প্রোডাকটিভ ছিল ব্যাপারটা। মিউজিক থামতেই প্রতিটি পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। চিন্তাশক্তিও। এখন আবার খুব মৃদু সুরে বাজছে মিউজিক। তার মানে রানার উত্তর যদি লেয়ার্ডের মনমত না হয়, তাহলে ফের একই কাণ্ড ঘটাবে সে। হাই ফ্রিকোয়েন্সির উন্মাতাল মিউজিক-পাগল করা যন্ত্রণা।

'তুমি এখানে কোনও মিশনে এসেছ, তাই না, মাসুদ রানা?' আলাপী ঢঙে শুরু করল রজার সাইমুর। 'সেটা কি?'

'আপনি আসতে বলেছিলেন,' থেমে থেমে বলল ও। 'তাই এসেছি।'

'আমার বিশ্বাস অ্যাসকটের ঘটনাটা তুমিই ঘটিয়েছিলে, আমি যাতে আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হই,' মাথা দোলাল লেয়ার্ড। 'কার হয়ে এসেছ তুমি?'

রানা নিরুত্তর।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চাবুক হানল লেয়ার্ড। 'কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ?'

আবোল তাবোল বকতে শুরু করল ও। 'নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট···স্টীল ডেসেলের মধ্যে থাকে কোর···পুরু পডের মত দেয়াল···'

'আসল কথা বলো, রানা। আমি ফালতু কথা শুনতে চাই না। কে পাঠিয়েছে তোমাকে? কোন্ এজেন্সি?'

উত্তর নেই।

'শেষবারের মত জানতে চাইছি আমি, মাসুদ রানা। বলো!'

ভথৈবচ।

একটুপর আবার শুরু হলো শব্দ যন্ত্রণা। খুলি হয়ে সারাদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত বয়ে বেড়াতে লাগল হাই ফ্রিকোয়েন্সি মিউজিক, অবর্ণনীয় কষ্টে চেঁচিয়ে, দুমড়ে-মুচড়ে, কুঁকড়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকল রানা মরিয়া হয়ে। এবার সহজে মুক্তি দিল না বিজ্ঞানী, একটু একটু করে ভলিউম বাড়িয়েই চলল। রানাকে ঘামের সাগরে চুবিয়ে অবশেষে যখন থামল, ও তখন প্রায় বদ্ধ উন্মাদ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চ্যাঁচাচ্ছে ঘরদোর ফাটিয়ে। পরিস্থিতি মোটামুটি আয়ত্তে আনতে প্রচুর সময় ব্যর্থ হলো। নরক দর্শন শেষে ফিরে রানা এখনও কাঁপছে ঠক্-ঠক্ করে, চোখ বিস্ফারিত।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে, রানা?'

'কোরের ভেতরের বারো ফুট লম্বা ফুয়েল রড···'

বুকের মধ্যে চাপা উল্লাস অনুভব করল ও। ঠেকানো গেছে! ঠেকিয়ে দিয়েছে রানা মে হরোইৎজকে। যে ড্রাগই ব্যবহার করে থাকুক সে, কার্যকরিতা নষ্ট হয়ে গেছে তার। সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণা, অসহনীয় হলেও শুষে নিয়েছে ওর মস্তিষ্ক।

'মুখ খোলো, রানা!'

'জাহান্নামে যাও তুমি, শয়তানের বাচ্চা লেয়ার্ড!' খেঁকিয়ে উঠল ও। চোখ বুজে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল।

'না!' একদম কানের কাছে মেকে এতজোরে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল রানা যে আপনাআপনি কুঁকড়ে গেল। 'আর না! এবার নির্ঘাৎ মরে যাবে লোকটা।'

'তাহলে? আসল কথাই তো শোনা হলো না!' বলে উঠল বিজ্ঞানী। 'কে দিল ওকে রিমোট কন্ট্রোল···'

'বলেছি তো, কাল আমার রুমে তোমার ভাইঝি ছাড়া কেউ যায়নি। ও-ই নিয়েছে। এর কাঁধে ভর করে পালাবার ফন্দী করেছিল সে।'

হঠাৎ করে ভেলভেটের মত মসৃণ এক টানেলে সেঁধিয়ে গেল রানা, নিচের দিকে ছুটছে, গতি মন্থর। ওর মধ্যেও লেয়ার্ড আর মের আলোচনা কানে গেল, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল না কি বলছে ওরা।

একটু পর গাছের গুঁড়ির মত দুই বাহু তুলে ফেলল ওকে বেড থেকে। বন্ধ চোখের সামনে পৃথিবী ঘুরতে শুরু করল বন-বন্ করে, তারপরই সব অন্ধকার।

পরেরবার যখন জ্ঞান ফিরল, নিজেকে আবছামত চেনা এক রুমে দেখতে পেল রানা—সেই ইস্ট গেস্টরুম। পরিচিত একটা চেহারাও দেখতে পেল—পিটার! ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে তৃপ্তির হাসি হাসছে। কড়া স্কটিশ অ্যাকসেন্টে বলল সে, 'গুইড ইভনিং! অনেকক্ষণ থেকে স্যারের ডিনার সার্ভ করার জন্যে অপেক্ষা করছি, সময় কি হয়েছে? বলি দেয়ার আগে লেয়ার্ড তোমাকে তরতাজা দেখতে চান কি না!'

'ভারি অমায়িক মানুষ,' বলে হাসল রানা। 'তোমার লেয়ার্ড। একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

মাথা দোলাল সে। 'পারো। তবে জবাব দেব কি না তা আমার ব্যাপার।'

'এখন দিন, না রাত?'

'তুমি কালা নাকি? বললাম না ইভনিং?'

'কি বার?'

'মঙ্গলবার,' বলে সোজা হলো পিটার। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করল। দু'মিনিট পর বড় এক ট্রেতে খাবার আর ছোট ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল ফ্রেঞ্চ-কাট্। আজ তার মুখে হাসি দেখল রানা।

'নাও, খেয়ে নাও,' দানব বলে উঠল। 'খেয়ে কৃতার্থ করো আমাদের। কয়েক ঘণ্টা পর আবার রওনা হতে হবে, জোগাড়যন্ত্র করতে হবে তার।'

'কোথায়?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইল ও।

হেসে মাথা দোলাল লোকটা। 'দেখতেই পাবে।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল। ঘটাং শব্দে লেগে গেল ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক লক্।

বিএসএস, লন্ডন। একইদিন দুপুরের ঘটনা।

নিজের রূমে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন সংস্থা প্রধান মারভিন লংফেলো। তাঁর মুখোমুখি বসে আছে এক মাঝবয়সী লোক। কমিউনিকেশনস অফিসার। একটু আগে গ্ল্যাসগো হয়ে আসা এক গোপন বার্তা জানাতে এসেছে চীফকে। কোঁচকানো কপাল চুলকালেন তিনি, উদ্বেগ বাড়ছে একটু একটু করে।

'কখনকার ঘটনা বললে?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'কাল রাতের। মানে, আজই খুব ভোরের, দেড়টার দিকে। গোলাগুলি, কার চেজ হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে কয়েকবার সাইমুর ক্যাসেলের কাছে। আমাদের ওখানকার সোর্স বলছে মাসুদ রানার স্যাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। দুপুরের পর ওটাকে ক্যাসেলে নিয়ে গেছে লেয়ার্ডের লোকজন। দূর থেকে কারের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে ওটাকে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে টর্চ দিয়ে।'

'এখন নজর রাখা হচ্ছে ক্যাসেলের ওপর?'

নেতিবাচক মাথা দোলাল লোকটা। 'খুব কঠিন অবস্থা, স্যার। মারকান্ডির বেশিরভাগ লোকই লেয়ার্ডের কর্মচারীর মত, ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বাইরের কেউ ওদের চোখে পড়ে গেলে প্রাণে বাঁচবে না।'

'আরগুয়েলো?'

'কাল দুপুরে শেষবার নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে ওকে। এফবিআই ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই গা ঢাকা দিয়েছে।'

আরও কিছু সময় ভাবলেন লংফেলো, তারপর চেয়ার ছেড়ে পিছনের জানালা দিয়ে সন্ধের রিজেন্ট'স পার্কের দিকে তাকালেন। আগেও এই রকম বড়-বড় বিপদে পড়েছে মাসুদ রানা, বহুবার। এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরেও এসেছে। এবার কি ঘটেছে ওর? খুব খারাপ কিছু? তাহলে সময়মত সিগন্যাল পেন কেন ব্যবহার করল না? এর মানে কি গাড়িতে ও ছিল না দুর্ঘটনার সময়? আর কেউ ছিল? কিন্তু তাই বা হয় কি করে? কাকে ধাওয়া করেছিল লেয়ার্ডের লোকজন?

ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। 'চেজের সময় গাড়িতে কে ছিল শিওর হওয়া যায়নি?'

'না,' মাথা দোলাল কমিউনিকেশনস অফিসার।
'আরগুয়েলোকে ফলোও করেনি রানা?'
'করেনি।'
'তার মানে ও ক্যাসেলেই আছে,' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে।
'মানে?'
'মানে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। রানা বন্দী।'
'ওয়ারেন্টসহ স্পেশাল ব্রাঞ্চকে পাঠানো যায় তাহলে, কি বলেন···'
'ওয়ারেন্ট! কোন্ গ্রাউন্ডে? বিদেশী এক এসপিওনাজ এজেন্টকে পাওয়া যাচ্ছে না?' মাথা দোলালেন বিএসএস চীফ। 'প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া··· ফোর্স নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে আনতে হবে, মাসুদ রানা সে চীজ নয়। হলে ওকে এ কাজে পাঠাতাম না আমি। তুমি বরং আমাদের ওয়াচ টীমকে সতর্ক করে দাও। নজর রাখতে বলো ক্যাসেলের ওপর। আই মীন, নজর রাখার চেষ্টা করতে বলো।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে আবার ভাবতে বসলেন বিএসএস চীফ। রানার গাড়ি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে।

ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। কি ভেবে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি, ঢাকায় খবর দিতে হয়।

নয়

খেয়েদেয়ে অনেক সুস্থ বোধ হলো রানার। দেহে শক্তি ফিরে আসতে লাগল একটু একটু করে। তন্দ্রামত এল কয়েকবারই, কিন্তু ঘুম এল না, সারারাত প্রায় জেগেই কাটাল। শুয়ে শুয়ে টর্চার চেম্বারে শোনা লেয়ার্ড আর মের ছাড়া-ছাড়া কথাগুলোর ভেতরের অর্থ খুঁজে বের করতে চাইল ও, তাও হলো না।

ভোর হতে না হতে পিটার এসে হাজির। উঠে তৈরি হয়ে নিতে হুকুম দিল, নাস্তা খেয়ে বেরুতে হবে। ঠিক আটটায় হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তোলা হলো রানাকে। ভ্যানের গায়ে অস্পষ্ট গোল্ড লেটারিঙে লেখা: রিচি গিলবার্ট, বেকার অ্যান্ড কনফেকশনার, মারকাল্ডি। বোঝা গেল এ মুহূর্তে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে চায় না লেয়ার্ড রজার সাইমুর। পিটারের নেতৃত্বে চার সশস্ত্র গার্ড উঠল ওর সঙ্গে।

ক্যাসেল থেকে প্রথমে গ্রাম পর্যন্ত এল ভ্যান, টের পেল ও। এখানে ভ্যান থেকে নামিয়ে তোলা হলো এক সিকিউরিটি ট্রাকে। সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল শব্দ দুটো স্টেনসিল করা ওটার গায়ে। এরপর শুরু হলো দীর্ঘ চলা। বাইরে দেখার মত একটা ফুটোও নেই ক্যাবের গায়ে, কাজেই কোনদিকে চলেছে অনুমানও করতে পারল না রানা। একটানা ছয় ঘণ্টা পথ চলে থামল ভ্যান। কিছু দেখা না গেলেও সময়ের সাথে গতি মোটামুটি মিলিয়ে একটা অনুমান করে নিয়েছে ও, এরমধ্যে কম করেও দুশো মাইল পেরিয়ে এসেছে ট্রাক।

ট্রাক থেকে নেমে দু'পা যেতেই একটা নিচু ছাদের বিল্ডিঙ। তার ভেতরে নিয়ে আসা হলো ওকে। হাতকড়া খুলে বাথরুমের প্রয়োজন সেরে আসার হুকুম দেয়া হলো। এরপর খাওয়া দাওয়ার পালা। পিটারসহ চার সশস্ত্র গার্ডের পাহারায় বসে খেতে হলো ওকে। ভেবেছিল খাওয়া শেষে আবার হাতকড়া পরানো হবে, কিন্তু হলো না।

চারটের দিকে বাইরে 'কপ্টারের আওয়াজ শোনা যেতে কাছে এসে দাঁড়াল পিটার। ঘাড়ে অস্ত্র দিয়ে জোর এক খোঁচা মেরে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'লেয়ার্ড এসে পড়েছেন। চলো। তবে সাবধান, কোনরকম চাল চালতে গেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব, মনে রেখো।'

চারটে অটোম্যাটিক অস্ত্রের কড়া পাহারায় বেরিয়ে এল রানা। পিটারের হাত এ মুহূর্তে খালি, ওর পাশাপাশি হাঁটছে সে। ট্রাক নেই আগের জায়গায়, সামনে খুদে একটা এয়ারস্ট্রিপ। ট্রাকটা সরাসরি বিল্ডিঙে ঢোকার মুখে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে তখন ব্যাপারটা চোখে পড়েনি। স্ট্রিপের এক মাথায় একটা চকচকে এগ্‌জিকিউটিভ জেট দাঁড়িয়ে আছে দেখল ও, কপ্টারটা তার কাছেই নেমেছে।

'হাঁটো!' পিছন থেকে মৃদু ঠ্যালা দিল ওকে পিটার। 'প্লেনের দিকে।'

ওটা একটা গ্রুমম্যান গালফস্ট্রীম, বুঝল ও, খুবই দামী এগ্‌জিকিউটিভ জেট। এঞ্জিন চালু রয়েছে। ওটার গায়ে অ্যালডান অ্যারোস্পেস ইনকর্পোরেটেড লেখা। হাঁটার ফাঁকে ঘুরে বিল্ডিংটার দিকে তাকাল ও। সেখানেও একই নাম। পাশে লেখা: ফ্লাইং ক্লাব, প্রাইভেট। রানার খেয়াল হলো, রজার সাইমুর যে সমস্ত কোম্পানির মালিক, এটা তার একটা।

ভেতরে, ফ্লাইট ডেক সংলগ্ন মোটামুটি বড় এক স্পেসে বসা লেয়ার্ড ও মে। সম্ভবত অফিস ওটা। বিজ্ঞানীর সামনের টেবিলে ম্যাপ ইত্যাদি অনেক হাবিজাবি। দ্বিতীয় সারিতে দুই পাশে দুই গার্ডের মাঝখানে নতমুখে বসে আছে রোজালিন। কোনদিকে নজর নেই। রানাকে দেখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না রজার বা মের, চোখ তুলে একবার তাকাল না পর্যন্ত। গল্পে মশগুল। প্লেনের পিছনদিকে বসানো হলো ওকে, প্রায় পরক্ষণে গড়াতে আরম্ভ করল গ্রুমম্যান। ছোটখাট এক দৌড় সেরে আকাশে উঠে পড়ল।

নিক আর ফ্রেড বসেছে রানার দু'দিকে। ব্যাটাদের জন্যে বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে না ও, কোন্ ফ্লাইট পাথ অনুসরণ করছে জেট, মেঘের মধ্যে দিয়ে চলছে বলে বোঝার কোন পথ নেই।

প্রায় এক ঘণ্টা ওড়ার পর হাইট কিছুটা লূজ করল পাইলট জেটের বাঁদিকের পাখা কাত হলো। তখনই দূরে উপকূলরেখা দেখতে পেল ও। অনেক দূরে। তার একটুপর বিশাল সমতল জমি, পাহাড়, বীচ, বেশকিছু সাদা হলিডে বিল্ডিঙ ইত্যাদি ডিঙিয়ে ইনল্যান্ডের ওপর চলে এল জেট। এখানে-ওখানে ছাড়াছাড়া কিছু বাড়ি, ফার্মহাউস, সাপের মত আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখা গেল। ওগুলো ছাড়াতে দেখা দিল বড় এক পুরানো শহর।

দ্রুত স্মৃতির পাতা হাতড়াতে শুরু করল রানা। দৃশ্যটা চেনা। আগে এসেছে

ও এখানে। কোথায় জায়গাটা? কোথায়? জেট নামছে। দুই সারি সীটের মাঝের আইল জুড়ে বসে আছে পিটার। নিজের সীটে বসে কাত হয়ে ঝুঁকে অন্যপাশে বসা লেয়ার্ডের নির্দেশ শুনছে মন দিয়ে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন। কথার ফাঁকে থেকে থেকে ম্যাপে চোখ বোলাচ্ছে বিজ্ঞানী, নোট নিচ্ছে।

এরমধ্যে রোজালিনের সাথে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে রানার। মুখ শুকনো মেয়েটির, চোখের নিচে হালকা কালির প্রলেপ। যথেষ্ট মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে।

বাইরে তাকিয়ে থাকল রানা। আরও নেমেছে জেট। হঠাৎ করেই জায়গাটা চিনে ফেলল ও। পারপিগনান! ফ্রান্স! অতীতে স্বাধীন কিংডম ছিল পারপিগনান, কিংস অভ মাজোরকা ছিল এর শাসক। বর্তমানে ফ্রান্সের অধীন। আগে এসেছে রানা এখানে।

পাক্ খেয়ে পারপিগনান এয়ারপোর্টের দিকে এগোল জেট। শহর থেকে তিন-চার মাইল দূরে জায়গাটা। দৌড় শেষ করে টার্মিন্যাল ভবন থেকে একটু দূরে, পেরিমিটার ফেন্সের কাছাকাছি থামল। দরজা খোলার আয়োজন করছে পিটার, পাশ থেকে ফ্রেঞ্চ কাট নিক শক্ত মুঠোয় রানার এক বাহু চেপে ধরল। 'বাইরে আমার সাথে ভদ্রলোকের মত হাঁটবে, কেমন?' বলল সে নিচু গলায়। 'লেয়ার্ডের অনুমতি আছে, কোনরকম বেচাল দেখলেই তোমাকে গুলি করব। কথাটা মনে রেখো।'

দরজা খোলা হলো। উঠে পড়ল রজার সাইমুর, রানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করল। 'আশা করি আমাদের যাত্রা উপভোগ করেছেন আপনি, মিস্টার রানা। অবশ্য বাইরের কিছু যে দেখতে পাননি, তা জানি। মন খারাপ করবেন না। আমার কালকের ফ্লাইটে আপনি যাতে একটা রিঙসাইড সীট পান, সেদিকে খেয়াল থাকবে আমার।'

রানা হাসল। 'কালকের ফ্লাইট আরও উপভোগ্য হবে নিশ্চই?'

'তা হবে,' পাখি-নড করল বিজ্ঞানী। 'হাজার গুণ বেশি উপভোগ্য হবে, কোন সন্দেহ নেই।' তিড়িং বিড়িং পায়ে নেমে গেল সে প্লেন থেকে। মে অনুসরণ করল। পাশ কাটাবার সময় মুচকে হাসল ওর দিকে ফিরে। অনেকটা সৌজন্যের হাসি। একই সঙ্গে দুই গার্ড পাহারা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল রোজালিনকে। তার উদ্দেশে চওড়া হাসি দিল রানা। বোঝাতে চাইল ঘাবড়িয়ো না, ধৈর্য ধরো।

বিশাল এক হ্যাঙ্গারের কাছে দাঁড়িয়েছে গ্রুমম্যান। তার সঙ্গেই একটা ছোট অফিস বিল্ডিঙ। মাথায় অ্যালডান অ্যারোস্পেস (ফ্রান্স) লেখা নিওন সাইন জ্বলছে। রানাকে নিয়ে সেদিকে এগোল ওর দুই গার্ড, পিটার সামনে। অফিসটা তারকাঁটার পেরিমিটার ফেন্সের মাত্র কয়েক গজ এপাশে। বেশ নিচু ফেন্স। কয়েক জায়গায় আবার ছেঁড়া। ওপাশে একটা রেললাইন, সোজা পারপিগনানের দিকে চলে গেছে। তারপরই চওড়া রাস্তা—রুট ন্যাশনেল। প্রচুর গাড়ি রাস্তায়, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শহরের দিকে ছুটে চলেছে।

নিজের পাহারাদারদের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। একদম সহজ স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে লোকগুলো, দেখে মনেই হয় না ওকে গার্ড দিয়ে নিয়ে

চলেছে। টারম্যাকে কাছে-দূরে বেশ কয়েকজন গ্রাউন্ড ক্রুকে দেখা যাচ্ছে, নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত দেখাচ্ছে ওদের। কাছের ছেঁড়া ফেন্সের ওপর দিয়ে নজর ঘুরে এল রানার। ত্রিশ সেকেন্ড, ভাবল ও, সুযোগ পেলে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ওখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। খুব সহজ হবে না কাজটা, সহজে হাল ছাড়বে না স্কটিশ হারামজাদাগুলো। তবু, রানা প্রায় নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত ও সফল হবেই। যদি সুযোগটা পাওয়া যায়।

লেয়ার্ড আর মে অফিসে ঢুকে পড়েছে, রোজালিনকে নিয়ে ঢুকছে তার দুই গার্ড, এমন সময়, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এল সুযোগটা। হ্যাঙ্গারের কোণা ঘুরে খোলা জায়গায় এসে পড়ল একদল লোক—কমার্শিয়াল এয়ার লাইনারের ইউনিফর্ম পরা। আট-দশজনের কম নয়। কথা বলছে, হাসছে। সন্ধের ম্লান আলোয় তাদের ক্যাপের গায়ে লেখা সোনালী অক্ষরগুলো পড়তে পারল রানা কোনরকমে। ই. এ. এস—ইওরোপিয়ান এয়ার সার্ভিসেস। ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চে কথা বলছে ওরা। দলটার পিছনে দুই ফ্রেঞ্চ কাস্টমস অফিসারও আছে। প্রায় একই মুহূর্তে মাইলখানেক দূরে লম্বা একটা ট্রেন দেখতে পেল ও। এদিকেই আসছে। শহরের দিকে যাবে ফেন্সের ওপাশ দিয়ে।

ঝুঁকিটা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রসল ও চট্ করে। দারুণ এক সুযোগ, মিস্ করা কোনমতেই উচিত হবে না। অফিসের দরজার গজ দশেক দূরে থাকতে হাঁটার গতি কমিয়ে দিল রানা। দৃঢ় বিশ্বাস, এত মানুষের সামনে ওকে তেমন বাধা দিতে পারবে না ব্যাটারা। ব্যাপার খেয়াল হতে নিকও গতি কমিয়ে দিল, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। পিটারকে ডাকবে কি না ভাবল সে একবার, তারপর মত পাল্টে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল রানার পাঁজরে। 'হাঁটো!' ধমকে উঠল চাপা গলায়। 'জলদি!'

খেঁকিয়ে উঠল ও। 'আরে রাখো তোমার মীটিঙ!' এমনভাবে বলল, যেন অফিসারদের সবার কানে যায়। আঙুল তুলে দলটাকে দেখাল। 'আগে আমার বন্ধুর সাথে কথা বলব, তারপর অন্য কাজ।'

নিক আর কিছু বলার বা করার সুযোগই পেল না, চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, লম্বা পায়ে হাঁটা ধরল দলটার দিকে। 'হাই, জনি!' চেঁচিয়ে উঠল দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে। 'তুমি এখানে কি করছ?'

বিপদ টের পেয়ে আগেই থেমে গেছে পিটার, দ্রুত পিছিয়ে এল সে। ডান হাত পকেটে ভরে দিয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস বের করার সাহস পাচ্ছে না। 'ফিরে এসো!' চাপা গলায় হুমকি দিল সে। 'এক্ষুণি! নইলে গুলি করব আমি।'

'কচু করবে তুমি, হারামজাদা!' মৃদু কণ্ঠে বলেই আবার হাঁক ছাড়ল ও। 'অ্যাই, জনি!' দ্রুত হাঁটছে।

ওদিকে অফিসারদের দলটাও প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিভ্রান্ত চোখে। সবার মুখে ভদ্রতার, ধৈর্যের হাসি। পিছনে লেয়ার্ডের 'ধরো ওকে, পিটার!' শুনেই দৌড় শুরু করল রানা, কয়েক লম্বা লাফে পৌঁছে গেল দলটার কাছে। আড়নজর ট্রেনের ওপর, প্রায় এসে পড়েছে ওটা। সুড়ুৎ করে দলের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। সামনের বাধা সরিয়ে ওপাশে যেতে চাইছে।

হাত চালাবার ফাঁকে সবাই যাতে শুনতে পায়, এমনভাবে বলতে লাগল, 'খুব

দুঃখিত। বড় বিপদে পড়েছি। পিছনের ওরা গুণ্ডা, আমাকে ধরতে চায়। তাই একটু অভিনয় করতে হলো। কিছু মনে করবেন না,' ইত্যাদি বলতে বলতে দল থেকে বেরিয়ে পড়ল ও, তারপর ঝুঁকে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল ফেন্সের সবচেয়ে কাছের ছেঁড়া অংশের দিকে। ট্রেন তখন বড়জোর একশো গজ দূরে, বেশ জোরেই আসছে। পিছনে উঁচু গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল, তর্ক বেধে গেছে অফিশিয়াল আর লেয়ার্ডের লোকদের মধ্যে। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে।

কোনদিকে তাকাল না রানা, ফেন্স পেরিয়ে সোজা হয়েই ঝেড়ে দৌড় লাগাল রেললাইন এমব্যাঙ্কমেন্টের দিকে। লাইন, গ্র্যাভেল সব কাঁপছে ট্রেনের কাঁপুনির সাথে তাল রেখে। এঞ্জিনের আওয়াজের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে পিছনের সমস্ত হট্টগোল। ও জানে এখনই এসে হাজির হবে পিটার, এবং প্রয়োজন হলে গুলিও করবে। কেউ টের পাবে না গুলির আওয়াজ। কাজেই দেরি করার উপায় নেই। দৌড়ের ওপর পিছন ফিরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল ও। ষাঁড়ের মত ছুটে আসছে পিটার।

লাইনের কিনারা ঘেঁষে আগুয়ান ট্রেনের দিকে দৌড় শুরু করল রানা। দশ পা এগিয়ে যেই বুঝল সময় হয়েছে, অমনি দুই লাফে কোনাকুনি লাইন পেরিয়ে অন্যপাশে চলে এল ও। পরমুহূর্তে ঠিক পিঠ ঘেঁষে হুস্ করে বেরিয়ে গেল এঞ্জিন, বাতাসের প্রবল তোড়ে কোটের দুই প্রান্ত ফত্ ফত্ করে উড়ল খানিক। এমব্যাঙ্কমেন্ট থেকে নেমে পিছনে তাকাল রানা। না, নেই পিটার।

সময় নষ্ট না করে রুট ন্যাশনেলের দিকে ছুটতে শুরু করল। ট্রেন যথেষ্ট লম্বা, বেশ কিছু সময় পাওয়া যাবে হাতে, এরমধ্যে সরে পড়তে হবে যত দূরে সম্ভব। দুই মিনিটে রাস্তায় পৌঁছে গেল ও। হাত তুলে একটা ঝক্কর মার্কা পিক-আপ্ ট্রাক থামাল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'পারপিগনান যাচ্ছেন?' ফ্রেঞ্চে প্রশ্ন করল ড্রাইভারকে।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'লিফট?'

'উঠুন,' মুখ নাচিয়ে পাশের সীট দেখাল সে।

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘন ট্রাফিকে মিশে গেল পিক-আপ্। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পিছনে তাকাল রানা। নেই কেউ। থাকার কথাও নয়, ব্যর্থ হয়ে নিশ্চই তক্ষুণি ফিরে গেছে পিটার, ভাবল ও। অন্য কোন সংক্ষিপ্ত পথ ধরে হয়তো এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে পারপিগনানের দিকে। লেয়ার্ড এখানে নিঃসন্দেহে সুসংগঠিত, তার জন্যে এসব কোন ব্যাপারই নয়। হয়তো সামনে কোথাও ওর জন্যে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করবে তার লোকেরা। হয়তো ফুল-স্কেল কোমিং অপারেশন চালাবে ওকে ধরার জন্যে। মোটকথা এ পর্যায়ে রানাকে কোনমতেই মুঠোর বাইরে থাকতে দেবে না সে।

হেডলাইট জ্বেলে দিল ড্রাইভার। পাশ ফিরে রানাকে দেখল কিছু সময়। 'শহরে কোথায় যাবেন?'

জবাব এড়িয়ে গেল ও। 'ক'টা বাজে?'

'নয়টা।'

রানার খেয়াল হলো, অন্য টাইম জোনে আছে ও। ব্রিটেন থেকে ফ্রান্স এক ঘণ্টা পিছিয়ে।

'উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন?'

'উৎসব?' ঘুরে তাকাল ও।

হাসল ড্রাইভার। 'আপনি বিদেশী বলে জানেন না, আজ আমাদের বাৎসরিক আনন্দ-উৎসব আর ফীস্টের দিন। আপনাকে স্বাগতম। *লা ফ্রেমি অ্যারাইভ এন পারপিগনান!*'

'ধন্যবাদ। খুব বড় উৎসব?'

'খুব বড় মানে! চলুন না, ভিড়ে পা ফেলতেই হিমশিম খেতে হবে আপনাকে। হাজার হাজার মানুষের মেলা বসে গেছে এতক্ষণে।'

খুশি হলো রানা। খেয়াল হলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই বছরে একবার এই বিশেষ উৎসব হয়। রঙবেরঙের মিছিল, উদ্দাম নাচ-গান, পরস্পরকে ফুল উপহার দেয়া, কার্নিভাল শো আর বেহিসেবী খাওয়া-দাওয়া। মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পারপিগনানে একে বলে দ্য গ্রেট ফীস্ট অভ সেইন্ট জন।

সন্ধের পর অলিম্পিয়ান সেরিমনির মত কয়েকজন রানার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এখানকার সর্বোচ্চ পয়েন্ট মাউন্ট ক্যানিগোর চুড়োর নির্দিষ্ট বড় এক মশালে আগুন জ্বেলে দেয়ামাত্র অনুষ্ঠান শুরু হয়। চলে মাঝরাত পর্যন্ত।

ভালই, মনে মনে হাসল। এত ভিড়ের মধ্যে ওকে পাকড়াও করা লেয়ার্ডের পক্ষে বেশ কঠিনই হবে।

দশ

শহর কেন্দ্রের প্লেস দো লা রেজিসট্যান্সে নেমে পড়ল রানা। মানুষের ভিড়ে সত্যিই পেভমেন্টে পা রাখা দায়। রাস্তার ট্রাফিক শামুকের গতিতে এগোচ্ছে, প্রচুর পুলিস রয়েছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে। মহাব্যস্ত।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল ও। বেশ কয়েক বছর আগে এখানে এসেছে, পা বাড়াবার আগে কোনদিকে কি আছে মনে করে নেয়া দরকার। ওর সামনেই সেই বড় মশাল, রানার ওখানে আগুন ছোঁয়ানোমাত্র শুরু হবে অনুষ্ঠান। তার ওপাশে এক কাঠের ব্রিজ। শহর চিরে বয়ে যাওয়া টেট নদীর দু'পারের সংযোগ রক্ষা করছে ওটা। আপাতত গাড়ি আসা-যাওয়া বন্ধ ওর ওপর দিয়ে।

পদচারীদের জন্যে অল্প জায়গা রেখে বাকিটা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে স্টেজ। মিউজিশিয়ানরা *সারডানা* বাজাচ্ছে ওখানে। ব্রিজের ওপারে মিনারের মত উঁচু লাল ক্যাসটেলাইট, বা পুরানো শহরের প্রবেশদ্বারের কাছেও প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছে। কিছু একটা হচ্ছে ওখানে, এতদূর থেকে বোঝার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি আসল কাজ সারা দরকার, ভাবল রানা। ফোন করা দরকার লন্ডনে। কাছের ডিরেক্ট ইন্টারন্যাশনাল ডায়ালিঙ সিস্টেমের ফোন বুদটা কোথায়? কতদূরে?

কিন্তু এখানে ওই লাইন কতটা নিরাপদ? মোটেই নিরাপদ নয়। কাঁচের কফিনে আটকা পড়ার ইচ্ছে নেই ওর। তাছাড়া ওতে নগদ টাকা প্রয়োজন, পকেটে ফুটো পয়সাও নেই। সঙ্গে অবশ্য আছে, গোপন জায়গায়, বের করতে নিরিবিলি জায়গা দরকার।

এ মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে জরুরী কাজ, ভাবছে রানা, সেটা হচ্ছে জনসমুদ্রে মিশে থাকা। শুধু তাতেই চলবে না, চোখ দুটোকে সজাগ-সতর্কও রাখতে হবে। বলা যায় না, এরমধ্যে হয়তো লেয়ার্ডের লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে ওর খোঁজে, ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। যদি দেখা পেয়েই যায়, কি করবে, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এত মানুষের মধ্যে থেকে ওকে যে ধরে নেয়া যাবে না, তা ওরা বোঝে। বোঝে বলেই সে সবের ধার দিয়েও যাবে না। সবার অলক্ষে কোন বিষাক্ত ড্রাগ পুশ করে কাজ সারতে চাইবে।

এ মুহূর্তে পুলিসের সাহায্য চাওয়ারও উপায় নেই মাসুদ রানার। কারণ সঙ্গে কোন কাগজপত্র নেই। এ অবস্থায় ধরতে পারলে বরং সোজা ওকে আটকে দেবে ব্যাটারা, অন্তত আজ রাতের জন্যে। তারপর, হয়তো ওর কথা শুনবে তারা, কাল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে অনেক। পা বাড়াল ও, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে শুরু করল সামনে কোথায় সাইড স্ট্রীট আছে, তার খোঁজে।

সবে দু'পা এগিয়েছে, তখনই এক কালো মার্সিডিজের ওপর চোখ পড়ল। ওর মাত্র কয়েক গজ সামনে ব্রেক কষল ওটা ট্রাফিক পুলিসের ইঙ্গিতে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যেতে বলছে সে ওদের—গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়া হবে এখনই। ড্রাইভারের পাশের আরোহীটিকে দেখামাত্র রানার হার্ট একটা বিট্ মিস করল। পিটার! অন্যদের দেখল। ড্রাইভ করছে ফ্রেড, অন্য তিনজন গায়ে গায়ে লেগে বসে আছে পিছনের সীটে। সেই পাঁচ স্কটিশ গুণ্ডা।

ফ্রেড মুখ বের করে ফ্রেঞ্চে কিছু বলল পুলিস লোকটিকে, জবাবে অধৈর্যের সাথে মাথা দোলাল সে। আঙুল তুলে ফিরে যাওয়ার পথ দেখাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেমে পড়ল পিটার, সঙ্গে পিছনের আরও দু'জন। ফ্রেঞ্চ কাট আছে ওর মধ্যে। রাস্তার ওপাশের জনারণ্যে মিশে যাওয়ার আগে ফ্রেডকে কী সব নির্দেশ দিল পিটার। মাথা বারবার ঝাঁকিয়ে সায় দিল লোকটা, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলল। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল সবাই।

ব্রিজে জোর ড্রাম বিটের তুফান উঠল। কেউ একজন ঘোষণা করল মশাল পৌঁছতে আর অল্প বাকি, পৌঁছলেই শুরু হবে নতুন *সারডানা*।

রানা ব্যস্ত নিজের কাজে, পরিচিত একটা জায়গা খুঁজছে। প্রাচীন এক স্কয়্যার—পথের পাশের কয়েকটা কাফের চেয়ার-টেবিল সাধারণ সময়ও প্রায় পুরোটাই দখল করে রাখে সন্ধের পর। আজ নিশ্চই আরও বহুগুণ বেশি ভিড় হবে ওখানে। বাঁ মুখী এক মোড়ে পৌঁছল ও। এখানে রাস্তা জুড়ে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে একদল নারী-পুরুষ। বিচিত্র রঙচঙে পোশাক সবার পরনে। নাচ শুরু করার জন্যে প্রস্তুত, মশাল পৌঁছেছে ঘোষণা হলেই শুরু করে দেবে। সবার মুখে নিরুদ্বেগ, নির্মল হাসি। চেহারা উদ্ভাসিত।

একটা রোডসাইড কাফে পেরিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে যাচ্ছিল কেবল রানা,

এমন সময় ওপাশের ভিড় ঠেলে উদয় হলো পিটার। ঝট্ করে পিছিয়ে এল ও। ভিড়ের পিছনের প্রান্তে এসে গলা উঁচু করে তাকিয়ে থাকল সামনে। রাস্তার মধ্যে দিয়ে গদাইলশকরী চালে হাঁটছে দানব, তীক্ষ্ণ চোখে দু'দিকের জনতার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। রানার ডানে, একটু দূরে দেখা গেল নিককে। সে-ও একই কাজে ব্যস্ত।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না, ভেবে আবার পা চালাল রানা। প্রায় পাঁচ মিনিট চলার পর পরিচিত সেই স্কয়্যারের ইন্টারসেকশন চোখে পড়তে খুশি হয়ে উঠল। আরও দু'মিনিট পর জায়গামত পৌঁছল। জায়গাটা এক সময় পারপিগনানের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল—নাম লজ ভি মের। এখানকার বাড়িঘর-দালানকোঠা সব ভেনিশিয়ান কায়দায় তৈরি। সেই উঁচু খিলানওয়ালা চওড়া জানালা, খিলানে তেমনি কারুকাজের ম্যাসনরি।

থেমে দাঁড়িয়ে কিছু সময় পিছনদিকে নজর বোলাল ও। না, চেনা মুখ দেখা যায় না একটাও। নিশ্চিন্তে আবার এগোল। স্কয়্যারের এক কোণের পরিচিত বার টাবাকে ঢুকে সোজা *টয়লেট্টির* দিকে এগোল। বেশ কয়েকটা ক্যাবিনেট এখানে। তার একটায় ঢুকে ব্যস্ত হাতে বোল্ট লাগিয়ে দিল। পরক্ষণে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা।

জুতোর হীলের বেল্ট থেকে প্রথমে বের করল চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার ছুরিটা, তারপর কোমরের পুরু চামড়ার ডবল স্টিচড্ বেল্ট খুলে ফেলল। চার ইঞ্চি পর পর খাড়া স্টিচ আছে ওটার পুরোটা জুড়ে, দেখে ডিজাইন মনে হয়। আসলে তা নয়, ওগুলো ইমার্জেন্সি কারেন্সি ব্যাঙ্ক। এইরকম জরুরী পরিস্থিতির জন্যে রাখা হয়েছে এ ব্যবস্থা। ইওরোপের প্রায় সব দেশের কারেন্সি কিছু কিছু করে আছে প্রতিটি খোপে। আটটা খোপ।

ছুরির মাথা দিয়ে যথাসম্ভব নিখুঁত করে লেজের দিকের তিন নম্বর খোপের স্টিচ্ কেটে ফেলল রানা। ভেতর থেকে বের হলো ছোট-বড় নোট মিলিয়ে কিছু ফ্রাঁ, দুশো পাউন্ডের সমপরিমাণ। বিরাট কিছু নয় ঠিকই, তবে ওর বর্তমান প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। টাকাটা কোটের পকেটে, আর ছুরি প্যান্টের পকেটে রাখল রানা। বেল্ট পরে বেরিয়ে এল। বার থেকে এক প্যাকেট ডিস্ক ব্লিউ সিগারেট ও দেশলাই কিনে ধীরেসুস্থে ধরাল একটা। কফি অর্ডার দিয়ে চারদিকে সতর্ক নজর বোলাতে লাগল। মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে ঝড়ের গতিতে।

কফি খেয়ে বের হয়ে পড়ল রানা। যে পথে এসেছে, সে পথে চলল। পোস্ট অফিসে যাবে, ওখান থেকে ফোন করবে প্রথমে লংফেলো, তারপর ঢাকায়, রাহাত খানকে। প্রথম ফোনটা খুবই জরুরী।

রাস্তার ভিড় আরও বেড়েছে ইতোমধ্যে। নাচ, হৈ-হল্লা, মিউজিক, সব মিলিয়ে পারপিগনানের পরিবেশ সরগরম। সবই দেখছে রানা, আবার কিছুই দেখছে না। ভিড়ের মধ্যে সন্দেহজনক মুখ খুঁজছে কেবল। উৎসবের মূল জায়গা ছেড়ে চলে এল ও, দ্রুত এগোল প্লেস আরাগোর দিকে। পোস্ট অফিসটা ওখানেই, খেয়াল হয়েছে পরে।

জায়গাটা অভিজাত এক বিপণী কেন্দ্র। প্রচুর দোকান আর বার, তবে

মানুষজন খুবই কম। একটুপর প্রায় নির্জন পোস্ট অফিসে পৌঁছে গেল ও, পাথরের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সামনেই একসার ফোন বুদ, ডিম লাইট জ্বলছে ভেতরে। কেউ নেই ওখানে। পকেটে হাত ভরে কিছু খুচরো বের করল রানা, ওর থেকে বাছাই করে আলাদা করল এক ফ্রাঁর ছয়টা। প্রথম কলের জন্যে যথেষ্ট।

স্লটে এক ফ্রাঁ ফেলে ডায়াল টোনের অপেক্ষায় থাকল ও, তারপর কান্ট্রি আর সিটি কোড ঘোরাল দ্রুত, সবশেষে আসল নম্বর। অটো ডায়ালিঙ সিস্টেমের নানারকম আওয়াজ আসছে ওর ডান কানে, বাঁ কানে দূরের হৈ-হল্লা। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সিকোয়েন্স কমপ্লিট হওয়ার শব্দ শুনল রানা, তারপরই এল ও প্রান্তে রিঙ বাজার পরিষ্কার আওয়াজ।

দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুলল কেউ। 'ডিউটি ওয়াচম্যান, ট্রান্সওয়ার্ল্ড এক্সপোর্টস। কে বলছেন?'

'এম আর নাইন ফর মারভিন···' আর এগোতে পারল না রানা পাঁজরে শক্ত কিছুর চাপ অনুভব করে। চাপা গলায় বলে উঠল কেউ, 'উট (আউট), ফাস্ট! নইলে গুলি খাবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে তাকাল ও। একেবারে গায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গার্ড দলেরই সদস্য, তবে এর নাম ও জানে না।

'ফাস্ট!' আবার দাবড়ি লাগাল লোকটা। 'জলদি রাখো টেলিফোন!'

মানুষটার জন্যে আফসোস আর করুণা, দুটোই হলো ওর। এসব ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা নিতে হয়, এ জানেই না। অস্ত্র হাতে শত্রুর খুব কাছে যে আসতে নেই, অন্তত তার পায়ের আওতা থেকে বাইরে থাকতে হয়, কেউ বোধহয় একে শেখায়নি।

হাসিমুখে ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো রানা, পরক্ষণে ডান হাঁটু আর রিসিভার, দুটোই একযোগে চালাল, বিদ্যুৎগতিতে। একই সঙ্গে থাবা দিয়ে তার পিস্তল ধরা হাত সরিয়ে দিল এক পাশে। জানে, এরকম সময় ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে পড়া আঙুলের টানে গুলি এমনিতেই বেরিয়ে যায়। হলোও তাই। প্রায় বদ্ধ বুদের মধ্যে বিকট শব্দ হলো গুলির, বুদের পিছনের পারটেক্সের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। দলা পাকিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল লোকটা। গোঙাচ্ছে। হাত থেকে ছুটে গেছে পিস্তল। ব্যস্ত হয়ে দুই আঘাত পাওয়া জায়গা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল ছট্‌ফটানির ফাঁকে, কোনটাই পৌঁছল না জায়গামত।

স্থির হয়ে গেল লোকটা। নাক বেয়ে রক্ত নামছে দরদর করে। হাতের ভাঙা হ্যান্ডসেট ছেড়ে দিল রানা। গুলির শব্দ নিশ্চই কারও না কারও কানে গেছে, অতএব এখনই সরে পড়তে হবে এ জায়গা ছেড়ে। ঝুঁকে ব্যাটার অস্ত্র তুলে নিয়ে অবাক হলো—ওরই ওয়ালথার! খুশি মনে ওটা ওয়েস্টব্যান্ডে ভরে রাখল।

বেরিয়ে পড়ল পোস্ট অফিস থেকে। জায়গাটা এখন আরও নির্জন। দোকানপাটে খদ্দের প্রায় নেইই বলা চলে, সবাই ছুটেছে উৎসব কেন্দ্রের দিকে। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় আচমকা তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল বেজে উঠল কাছেই কোথাও, পরমুহূর্তে সামনে থেকে একজোড়া হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখ

ধাঁধিয়ে গেল ওর। ওয়ালথার বের করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল চট্ করে, কিন্তু শেষ করা গেল না কাজটা। লাউড হেইলারে মোটা একটা গলা ফ্রেঞ্চে চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিস, মঁশিয়ে!'

ঘুরে পালাতে যাচ্ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে থেমেও পড়ল ভুলটা বুঝতে পেরে। সামনে থেকে নয়, আওয়াজটা এসেছে পিছন থেকে। গাড়ি থেকে নামল দুই ইউনিফর্মড পুলিস, পিছন থেকেও এল দু'জন। গাড়ির একজন হাত বাড়াল ওর দিকে। *'সি' এস্ট প্রিভি, মঁশিয়ে। আভেজ ভোয়া আন বিলেট?'*

'পাসপোর্ট?' সপ্রতিভ উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল রানা, যদিও জানে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে। 'সরি। ব্রিটিশ এমবাসিতে ফেলে এসেছি। ভেবেছিলাম এত বড় এক উৎসবের রাতে দরকার হবে না ওটা।'

'ভুল ভেবেছিলেন। বিদেশীদের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা ও-জিনিস সঙ্গে রাখার নিয়ম, সব দেশে,' বলল লোকটা। হাত বাড়িয়ে ওর ওয়ালথারটা বের করে নিল। উল্টেপাল্টে দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'ভারি আপত্তিকর! পিটারকে খবর দাও,' মুখ না তুলে সঙ্গীকে বলল সে।

চমকে উঠল রানা। এরা তাহলে লেয়ার্ডের হয়ে খুঁজছিল ওকে? জানে কিছু করার নেই, তবু এক পলক তাকাল পিছনে। হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে লাউড হেইলারধারী ও তার সঙ্গী। একজনের অস্ত্র ওর মেরুদণ্ড সই করে ধরা, অন্যজনেরটা ঘাড়। প্রথমজনের সঙ্গী ততক্ষণে ফিরে গেছে গাড়ির কাছে, কার ফোনে কথা বলছে।

দুই মিনিটের মধ্যে সামনের বাঁক ঘুরে তুমুল বেগে ছুটে এল সেই কালো মার্সিডিজ। পিটার আর ফ্রেড আছে ওতে। রানাকে দেখে চওড়া হাসি দিল দানব। প্রথমেই ওকে হাতকড়া পরাল সে, তারপর অফিসারের সাথে নিচু কণ্ঠে মিনিটখানেক কথা বলে গাড়িতে ঠেলে তুলল রানাকে।

টেপ বার বার রিওয়াইন্ড করে কথাগুলো শুনলেন মারভিন লংফেলো। সাতবারের বার নিশ্চিত হয়ে মুখ তুলে তাকালেন। ভীষণরকম গম্ভীর চেহারা, যেন পাথরে কুঁদে তৈরি। 'ঠিকই আছে,' বললেন তিনি। 'এটা রানারই গলা।'

'আমিও শিওর, স্যার,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডিউটি অফিসার।

'কোত্থেকে ফোন করেছে ও? কত নাম্বার?'

'নাম্বার এখনও জানা যায়নি, স্যার। তবে কলটা যে ফ্রান্স থেকে এসেছে, সে ব্যাপারে আমি শিওর। ইন কামিং কোড তাই বলে।'

'তো?' ভুরু চুলকালেন বিএসএস চীফ। 'নাম্বার ট্রেস করোনি?'

'চেষ্টা করছি, স্যার,' ডিউটি অফিসার বলল। 'তবে রাত একটু বেশি হয়ে গেছে বলে...'

'আবার যোগাযোগ করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাম্বারটা জানার চেষ্টা করো। ওরা যদি ঠিকমত সহযোগিতা না করে, আমাকে জানাও। আমি দেখব।'

'জ্বি,' দ্রুত উঠে পড়ল লোকটা। বেরিয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে লাল ফোনটার রিসিভার তুলে নিলেন বৃদ্ধ।

*

একে আগেই শেষ করে ফেলা উচিত ছিল, লেয়ার্ড,' বলল পিটার। 'বাঁচিয়ে রাখাতেই ঝামেলা হলো। শেষ করে দিলে···'

'থামো!' বিরক্তির সাথে হাত ঝাপটা মারল রজার সাইমুর। 'বেশি কথা বলো। বলেছি তো সময় হলে···' থেমে সরু এক টুকরো হাসি দিল।

অ্যালডান অ্যারোস্পেসের অফিসের বড় এক রূমে লেয়ার্ডের মুখোমুখি বসিয়ে রাখা হয়েছে মাসুদ রানাকে। এখনও হাতকড়া পরানো। দু'জনের মাঝে বড় এক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ডেস্ক। ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে বিজ্ঞানী। ও ধরা পড়ায় সন্তুষ্ট। ইশারায় পিটার ও তার সঙ্গীদের বেরিয়ে যেতে বলল সে। তারপর ডেস্কে ভর দিয়ে রানার দিকে মন দিল। হাসছে। একটা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা কোল্ট পাইথন নাড়াচাড়া করছে। বোঝাতে চাইছে, ও তেড়িবেড়ি করলে বিপদ ঘটবে।

'হাতে অনেক জরুরী কাজ ছিল, মিস্টার রানা, আপনি পালিয়ে যাওয়ায় শেষ করতে পারিনি,' বলল সে। 'তাতে অবশ্য বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। সেরে ফেলব এখন।' কয়েক মুহূর্ত পূর্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল। 'আপনার পরিণতির কথা ভেবে সত্যি ভারি আফসোস হচ্ছে, সাহেব। আমরা একজোট হয়ে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু হলো না। এয়ারপোর্ট থেকে যে কায়দা করে বেরিয়ে গেলেন, সে কথা ভাবলে এখনও তাজ্জব লাগে আমার। আপনি যে পেশারই হোন, মিস্টার রানা, সত্যিই করিৎকর্মা লোক।'

'ধন্যবাদ।' নিজের ওপর বিরক্তি লাগছে রানার। লেয়ার্ডকে ফাঁকি দেয়ার দু'দুটো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় কিছুটা হতাশও। ক'টা বাজে এখন? আর কত দেরি উন্মাদটার অপারেশন মেল্টডাউনের কাজ শুরু হতে? আর একটা সুযোগ কি পাবে ও একে বাধা দেয়ার? দান দান তিনদানে কি সাফল্য আসবে?

'যাকে ফোনের রিসিভার দিয়ে মেরে আধমরা করেছেন, তার সাথে কথা হয়েছে আমার। ও শুনেছে ফোনে কি বলেছেন আপনি। এম আর নাইন খুব সম্ভব আপনার কোড নেম, তাই না? কিন্তু মারভিনটা কে, মিস্টার রানা?'

মাথা নাড়ল ও। 'কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাই?' হাসি চওড়া হলো বিজ্ঞানীর। 'আমি কিন্তু পারছি। একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হওয়ার সুবাদে এক সময় আমাকেও ব্রিটিশ অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টে সই করতে হয়েছিল। তাতে নামটা দেখেছি। আমার যদি কোন ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে ভদ্রলোক ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ, মারভিন লংফেলো।'

'আচ্ছা!' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। ভাবছে, লন্ডন কি ওর ফোন কল ট্রেস্ করতে পেরেছে? পারার কথা। যদি তা হয়ে থাকে, সাইমুর এবং তার চ্যালা চামুণ্ডাদের খুঁজে বের করা কোন সমস্যাই হবে না লংফেলোর পক্ষে। অ্যালডান অ্যারোস্পেসকে সনাক্ত করাও খুব কঠিন কোন কাজ নয়, ব্যাপার শুধু সময়ের।

'আপনি তাহলে ওদের হয়ে কাজ করছেন, তাই না? অর্থাৎ ওরা আমার অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে জানে। আমি জানতাম জানে। পাত্তা দিইনি। বেশি কিছু বলার সুযোগ পাননি আপনি ফোনে, কেমন?' শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা।

'ভেবেছিলেন পালিয়ে বাঁচতে পারবেন, তাই না? আপনি জানেন না, এখানে আমি আমার নিজ গ্রামের মতই ক্ষমতাবান। যে মুহূর্তে পালালেন প্রায় এককুড়ি সিভিল ড্রেসড পুলিস ইনফর্মার সেই মুহূর্ত থেকে পথে নেমে পড়েছে আপনার খোঁজে। ইউনিফর্মড পুলিসও ছিল, তার নমুনা তো দেখেছেনই।'

রানা কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না।

পাখি-নড করল বিজ্ঞানী। 'বিএসএসের সাহায্য আসবে, সেই আশায় আছেন? ভুলে যান। স্বয়ং ঈশ্বরেরও এখন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার উপায় নেই, সে পথই রাখিনি আমি। আমার অপারেশন মেল্টডাউনের চেইন অভ ইভেন্টস শুরু হয়ে গেছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই প্যাট্রিকের ফ্যানাটিক, সো-কলড্ টেররিস্টরা দখল করে নেবে···'

'ছয়টা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর,' শান্ত গলায় বলল ও। সাইমুরের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের দেয়ালে চিড় ধরাতে যতটা পারা যায় করতে হবে। খেপিয়ে তুলতে হবে ব্যাটাকে।

হাজার ওয়াটের বালব্ জ্বলে উঠল যেন বিজ্ঞানীর মুখের মধ্যে। উদ্ভাসিত চেহারায় ঘন-ঘন নড করতে থাকল। 'ঠিক, ঠিক ধরেছেন, ছয়টা।'

আরও খোঁচা মারো, ভাবল রানা। 'একটা ইংল্যান্ডে, একটা এ দেশে, দুটো জার্মানিতে, আর দুটো আমেরিকায়।'

কপট বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত হলো লোকটার। 'সাংঘাতিক, মাসুদ রানা! ভেরি ক্লেভার! তবে এখন সেসব জেনে লাভ নেই, ঠেকাতে পারছেন না আমাকে আপনি। কেউ পারবে না।'

চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না ব্যাটার, কিন্তু রানাও সহজে হাল ছাড়ার বান্দা নয়। চালিয়ে যেতে থাকল খোঁচাখুঁচি। মুখস্থ নামগুলো বলে যেতে লাগল, 'হেইশাম ওয়ান, সেইন্ট-লরেন্ট-দ্য-ইয়স্ল, নর্ড টু-টু, এমেনহ্যাম, ইন্ডিয়ান পয়েন্ট থ্রী এবং সান ওনোফ্রি ওয়ান।'

'একসেলেন্ট!' টেবিলে চাপড় মারল লেয়ার্ড। 'দারুণ আপনার স্মৃতি শক্তি! সবই মুখস্থ করে ফেলেছেন দেখছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাল স্থানীয় সময় দুপুর একটা, ইংল্যান্ডের দুপুর বারোটায় যখন আমাদের যাত্রা শুরু হবে, তখনই প্যাট্রিকের কড়া মাড় দেয়া সুইসাইড স্কোয়াড শুরু করবে ইনডিভিজ্যুয়াল অ্যাসল্ট, এবং তারপর···'

'গণ্ডগোল ঘটে যাবে।'

'হোয়াট?'

'বলছি পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে,' মৃদু হাসল রানা।

'অসম্ভব! তেমন কিছুই ঘটবে না, কারণ মেল্টডাউনের পুরোটা আমি অনেক যত্নে, অনেক সময় নিয়ে সেট করেছি। কোথাও কোন লূজ এন্ড রাখিনি। কাজেই সে ধরনের কিছু ঘটার প্রশ্নই আসে না।'

'প্রস্তুতি যতই নিখুঁত হোক, টেরোরিস্ট অ্যাকটিভিটিজ শুরু হলে পাশার ছক উল্টে যেতে পারে।'

'কি করে?' কপট বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল সাইমুর। 'মাই ডিয়ার রানা,

আপনি নিশ্চই ছাগল মনে করেন না আমাকে! সে ধরনের সমস্ত সম্ভাবনার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করেছি আমি আগেই, এবং সব পথ সীলও করে রেখেছি। প্রথমে প্যাট্রিককে প্রায় এক কুড়ি রিঅ্যাক্টরের নাম দিয়েছিলাম আমি, তার মধ্যে যেগুলোকে সবচেয়ে ঝুঁকিহীন, নিরাপদ মনে হয়েছে, সেগুলোকেই ও বাছাই করেছে। তারপর ওগুলোর প্রতিটিতে নিজের চারজন করে মেয়ে-পুরুষ ঢুকিয়েছে। সে প্রায় একবছর আগে। এই সময়টা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেছি, কারণ জানি, ধৈর্যের ফল সবসময় মিষ্টি হয়।

'প্রতিটি স্টেশনে প্যাট্রিকের, মানে আমার, যে চারজন করে অনুচর আছে, তারা প্রত্যেকে বিশ্বস্ত, অনুগত। যে যার কাজের ক্ষেত্রে ভারি কর্মঠ। স্টেশনের কর্মকর্তা, সিকিউরিটি পার্সোনেলদেরও প্রিয়পাত্র ওরা। কাজেই কালকের প্রয়োজনে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ভেতরে নিয়ে যেতে কোনই অসুবিধে হয়নি···'

'ওসব অনেক সময়ই ব্যাকফায়ার করে,' ভেতরের উদ্বেগ চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা।

'উঁহু! সে ধরনের কোন অস্ত্র নয় ওগুলো। ছোটখাট।'

তার চোখে সেই অশুভ, সুপ্ত লাভার নড়াচড়া দেখতে পেল ও। অস্বস্তি লেগে উঠল। পাগলামির কোন লক্ষণই নেই ওখানে। তার মানে এক-আধটু নয়, পুরোই পাগল লোকটা। বদ্ধ উন্মাদ। কোন সন্দেহ রইল না তাতে রানার। এ ধরনের ঝুঁকি একমাত্র উন্মাদই নিতে পারে।

'সময়মত বড়জোর কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রয়োজন হবে ওসব,' বলে চলল বিজ্ঞানী। 'তাও দেখানোর জন্যে। কোনরকম রক্তপাত ঘটানোর জন্যে নয়। কন্ট্রোল রুম দখল করার সময় প্রয়োজন হবে বলে ওগুলো দেয়া হয়েছে ওদের।'

'এদের কতখানি চেনেন আপনি?'

'আমি? একটুও না! ওরা প্যাট্রিকের লোক, সেই ভাল চেনে ওদের। আমি যেভাবে বলেছি, ঠিক সেভাবেই লোকগুলোকে চালিয়েছে সে। খুবই বুদ্ধিমান মানুষ প্যাট্রিক। অনুমান করেছিল, আমার নির্দেশ ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি না, অন্য কাউকে দিয়ে আমি তা হয়তো যাচাই করে দেখব। সত্যি সত্যি তাই করেছি আমি, এবং কোন খুঁত পাইনি তার কাজে। এতে কি প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয় মানুষটা খুবই বিশ্বস্ত,' বলল রানা। লেয়ার্ডকে খুশি হয়ে উঠতে দেখে যোগ করল, 'কাজে কোন ফাঁক রাখেনি সম্ভবত এইজন্যে যে সময়মত নিজের লোকেদের সাহায্যে পুরো অপারেশনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে সে। মুক্তিপণ যদি কিছু আদায় হয়, সব নিজের পকেটে ঢোকাবে বলে।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'সে সম্ভাবনার কথাও ভেবেছি,' চওড়া হাসি দিয়ে বলল। 'সেই জন্যেই আপনাকে দিয়ে অপারেশন শুরুর আগেই ওকে পরপারে পাঠাতে চেয়েছিলাম, তা আপনি তো···সে যাক, বিকল্প ব্যবস্থা করেছি আমি। আজ রাতেই এখানে আসছে প্যাট্রিক, আমার কপ্টারে চড়ে। পথের মাঝে ওকে গুলি করে সাগরে ফেলে দেবে আমার লোক।'

'বাহ্, এ তো খুবই সহজ সমাধান। তাহলে আমাকে টাকা সাধাসাধির কি দরকার পড়েছিল?'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল তার। 'ভেবেছিলাম আপনি কত ওস্তাদ মার্সেনারি, তা পরখ করে দেখব। উপযুক্ত মনে হলে পরে পিটারের জায়গায় আমার সহকারী হিসেবে নিয়ে নেব আপনাকে। তখন কি আর জানতাম আপনি আসলে কে?'

চুপ করে থাকল ও।

'এ তো গেল একদিকের নিরাপত্তার কথা,' বলল বিজ্ঞানী কয়েক মুহূর্ত পর। 'আরও আছে। যে মুহূর্তে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব ওরা নেবে, মাস্টার কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগও সেই মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, নিজেদের বন্দী করে ফেলবে ভল্টের মত কন্ট্রোল রুমের ভেতরে। একই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সাথে নিজেদের কমিউনিকেশন লাইনও কেটে দেবে। তখন কেবলই আমার সাথে যোগাযোগ থাকবে ওদের, আমারই এক কোম্পানির তৈরি হাই-পাওয়ারড্ ট্রান্সিভারের মাধ্যমে। ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা আছে বিশেষ ওয়েভলেংথে, বাইরের কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে না। যদি পারেও; যদিও সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, আমার নির্ধারিত বিশেষ কোড না শোনা পর্যন্ত সাড়াই দেবে না ওরা।'

খানিক নিঃশব্দে হাসল লেয়ার্ড। 'একমাত্র আমি, আমিই পারি বিশেষ এক কোড ওয়ার্ড উচ্চারণ করে ওদের ঠেকাতে। যদি আমার দাবি সবাই মেনে নেয়, তাহলেই কেবল কাজটা করব আমি। নইলে...' শ্রাগ করে থেমে গেল।

'নইলে কোটি কোটি নিরীহ মানুষ মরবে।'

'সহজ যুক্তিতে সেরকমই বোঝায়। কিন্তু আসলে তা ঘটবে না। আমি যখন আমার দাবি পেশ করব, সারা বিশ্ব তা শুনবে। এবং জেনে রাখুন, বিশ্ব জনমত তখন আমার দিকে ঝুঁকবে। বিষয়টাকে অবহেলা করতে পারবে না এই চার দেশের সরকার। মেনে নেবে আমার দাবি, সে ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত আমি। জনমতের চাপে নয়, ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা ভেবে।' মাথা দোলাল লোকটা। 'ওরা বুঝবে, এ কোনও ছেলেখেলা নয়।'

'কি ভাবে দাবি পেশ করা হবে?' প্রশ্ন করল রানা। উন্মাদ মানুষটা যে কোথাও কোন ফাঁক সত্যিই রাখেনি, বুঝতে পেরে ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে।

'সময় হোক, জানতে পারবেন। আপনার জন্যে রিংসাইড আসনের ব্যবস্থা করেছি আমি, ওখানে বসে সব দেখতেও পাবেন। তারপর, অপারেশন শেষ হলে...'

'আমার মৃত্যু নিশ্চিত করা হবে।'

'অবশ্যই। শুধু আপনার নয়, আমার বিশ্বাসঘাতিনী ভাইঝিরও। আপনি আমার ক্যাসেলে আসার পর মেয়েটি কি কি করেছে, সব জেনে গেছি আমি মের ওষুধের গুণে।' এক চোখ টিপল সে। 'আফটার অল, মেয়েদের নার্ভ পুরুষদের মত শক্ত নয়। আপনি যা পেরেছেন, ও তা পারেনি।'

'তুমি জানো তুমি একটা বাস্টার্ড, রজার?' খুব শান্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'লেয়ার্ড উপাধী আর সম্পত্তির লোভে মেয়েটির বাবা-মাকে খুন করেছ তুমি। আপন ভাইকে খুন করেছ। এখন তার মেয়েকেও খুন করতে চাইছ। ইউ ব্লাডি সোয়াইন!'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে যাচ্ছে সাইমুর। দু'চোখের মণি জ্বলে উঠল। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সামলে নিতে পারল সে। তারপর হাসল। 'কে বলেছে আমি খুন করেছি ওর বাপ-মাকে? প্রমাণ আছে? নেই। প্লেন দুর্ঘটনায় মরেছে ওরা। ওটার ফুয়েল লাইনে গোলমাল ছিল।'

ঝুঁকে এল সে। 'তবে হ্যাঁ, আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, অফ দা রেকর্ড অবশ্য। কাজটা আমিই করেছি, সত্যি।' ষড়যন্ত্রের হাসি ফুটল তার মুখে। 'জীবনভর এই করে এসেছি আমি, জানেন? শীর্ষে ওঠার পথে কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করিনি, সব চুরমার করে এগিয়ে গিয়েছি। বাধা ভাই হোক, কি বাপ, দেখিনি।'

টেবিলে মৃদু চাপড় মেরে সোজা হলো বিজ্ঞানী। 'কথা অনেক হলো, আজ আর নয়। হাতে কাজ আছে কিছু, ওসব সেরে একটু বিশ্রামও নিতে হবে। তারপর কালকের দিনটা, না, বরং আজকের দিন বলাই ভাল। ভোর তিনটে তো বেজেই গেছে। সে যাক, আমার এখানে অবশ্য বিশ্রামের তেমন সুব্যবস্থা নেই, আমার ভাইঝির সঙ্গে একই সেলে বাকি সময়টা কাটাতে হবে আপনাকে। অসুবিধে হবে হয়তো, সে জন্যে আগেই দুঃখ প্রকাশ করে রাখছি। পিটার!' হাঁক ছাড়ল সে।

নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল দানব। পিছন থেকে দু'হাতে ধরে রানাকে দাঁড় করাল। 'যাওয়া যাক।'

'আর একটা প্রশ্ন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

ওঠার আয়োজন করছিল বিজ্ঞানী। থেমে গেল। 'কি?'

'কাল, বা আজ আমরা এখান থেকে আর কোথাও যাচ্ছি?'

মাথা ঝাঁকাল লেয়ার্ড।

'কোথায়?'

তর্জনী খাড়া করে আকাশ দেখাল সে। 'শূন্যে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ খুব বিরাট এক এয়ারক্রাফট আছে আমার, মিস্টার রানা। আমার উড়ন্ত টেস্টবেড। আমেরিকান বন্ধুদের তৈরি। এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক আছে বলে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারে ওটা। আমার প্রয়োজনের জন্যে সময়টা যথেষ্ট। ওই প্লেন নিয়ে আকাশে থাকব আমরা যতক্ষণ না আমার দাবি পূরণ হয়। প্রয়োজনের সময় নামব, আমার গোপন রিফুয়েলিঙ স্টেশন থেকে ফুয়েল নিয়ে ফের উঠে যাব। ওটায় আপনার জন্যে রিঙসাইড সীটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। না না, ভাববেন না, বেশি লম্বা সময় আপনাকে ধরে রাখব না আমি। নিচ থেকে পজিটিভ সাড়া পাওয়ামাত্র হিসেব চুকিয়ে ছেড়ে দেব। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'সন্তুষ্ট?' কানের কাছে মুখ এনে বলল পিটার। দরজার দিকে ঘোরাল ওকে। 'এবার যেতে মর্জি হোক।'

সরু প্যাসেজ ধরে ধাক্কা আর গুঁতো মারতে মারতে ওকে নিয়ে চলল লোকটা। বেশ কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে ওক কাঠের পুরু এক বন্ধ দরজার সামনে কলার টেনে দাঁড় করাল। চাবি বের করে দরজা খুলে দিল স্ট্রেড, পিটার হাতকড়া খুলে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিল ওকে। 'যান। শেষ ঘুম

ঘুমিয়ে নিন।'

হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে নিজেকে সামলাল রানা বেশ কসরৎ করে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দড়াম করে লেগে গেছে দরজা। ঘরটা ছোট, সরু। একটা অল্প ওয়াটের বালব জ্বলছে ভেতরে। সরু দুটো কট, মাঝে হাঁটাচলার জন্যে এক চিলতে জায়গা। ডানদিকের কটে বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে ঝিম মেরে পড়েছিল রোজালিন, আওয়াজ শুনে চোখ মেলল। পরক্ষণে লাফ মেরে উঠে বসল রানাকে দেখে।

'রানা!' কট থেকে এক লাফে ওর বুকের ওপর এসে পড়ল সে। 'আমি···আমি ভেবেছিলাম তুমি এবার হয়তো···'

'না, রোজ। পারিনি। আগেরবারও ধরা পড়লাম, এবারও।'

'তুমি জানো না,' মুখ তুলল মেয়েটি। 'কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটাতে চলেছে আমার চাচা। রানা···'

'আমি জানি, রোজ।'

'মে···মে বলেছে, কাল আমাকে মেরে ফেলা হবে।' চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠল তার। 'তোমাকেও। তার মানে···তার মানে···'

মুখ নামিয়ে আনল রানা, জোর করে ওর কথা বন্ধ করে দিল। একটু একটু করে কাঁপুনি থেমে এল রোজালিনের, ওর বুকের সাথে লেপ্‌টে থাকল। চোখ বন্ধ। পাতার ফাঁক দিয়ে পানি গড়িয়ে নামছে।

'এখনও সেরকম কিছু ঘটেনি, রোজ,' ওর কপালের চুল সরিয়ে দিল রানা। 'ভয় কি? মরলে তুমি একা মরছ না, আমিও তো থাকব তোমার সাথে।'

ওর চোখে কিছু খুঁজল হয়তো মেয়েটি, ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল। বোঝা গেল পরিস্থিতি মেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। এবার নিজেই রানার মুখ টেনে নামিয়ে আনল সে।

বিএসএস। লন্ডন।

ভোর ছটায় চীফের অফিসে ঢুকল ডিউটি অফিসার। ঘুমের অভাবে চোখ লাল তার। মনও খারাপ। ভাল কোন খবর আনতে পারেনি। মারভিন লংফেলোর অবস্থা আরও খারাপ। ঢাকা থেকে লন্ডনের পথে রওনা হয়ে গেছেন রাহাত খান, পৌঁছতে বেশি দেরি নেই। তাঁর মুখোমুখি হবেন কি করে তাই ভাবছেন।

'কোনও খবর পেলে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ন'টার আগে ওরা আমাদের কনফার্মড্ খবর জানাবে বলেছে, স্যার।'

চোখের তারায় রাগ ফুটল বৃদ্ধের। লাল চোখ আরও লাল হলো। 'আজকাল সবাই জরুরী ব্যাপারকে সিরিয়াসলি নিতে চায় না মনে হয়,' বললেন বিড়বিড় করে। 'আশ্চর্য! সামান্য একটা খবর জানাতে পুরো রাত লাগিয়ে দিল ওরা!'

রানা ফ্রান্সে কেন? কখন, কোন পথে গেল, সারারাত বসে বসে ভেবেছেন তিনি, জবাব পাননি। ওদেশের কোথায় কি করছে ও? রজার সাইমুরও ওখানে? কি ঘটছে ফ্রান্সে?

ওদিকে আরগুয়েলো পালিয়ে এসেছে আমেরিকা থেকে, এবারও তাকে

অল্পের জন্যে ধরতে পারেনি এফবিআই। সে-ই বা কোথায় গেল, ফ্রান্সে? এর অর্থ কি? যে জন্যে রজার সাইমুরের সাথে তার গোপন যোগাযোগ, তা কি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে? খুব শীঘ্রি ঘটতে যাচ্ছে খারাপ কিছু?'

সাইমুরের ক্যাসেলে স্পেশাল ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় এম আই ৫-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে বলে?

আপনমনে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। জেনারেলকে ফোন করার আগে একটু চাঙা হয়ে নিতে হয়। 'কফির কথা বলো, প্লীজ!' ডিউটি অফিসারকে বললেন। 'কালো, গরম, মিষ্টি আর কড়া। মনে হচ্ছে দিনটা আজ খুব কঠিন যাবে।'

এগারো

সকালে আবার হাজির ওরা, পিটার ও তার দুই সঙ্গী। অস্ত্র হাতে প্রথমে ভেতরে ঢুকল দানব, পরের দু'জন এল দুটো উপচে পড়া নাশতার ট্রে নিয়ে। রানা-রোজালিনকে এক কটে দেখে প্রথমজন হাসল বিকট চেহারা করে। 'বেশ বেশ। মনে হচ্ছে রাতটা বেশ ভালই কেটেছে তোমাদের। এবার ওঠো, লেয়ার্ড তোমাদের জন্যে স্পেশাল ব্রেকফাস্ট পাঠিয়েছেন, খেয়ে নাও।'

ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল অন্য দুই গার্ড। পিটার রুম থেকে বেরিয়ে ঘুরে তাকাল রানার দিকে। 'ছুরি-কাঁটা চামচ এক-আধটা খোয়া যায় না যেন। ওগুলো যখন নিতে আসব, সব ক'টা গুণে বুঝিয়ে দেবে তুমি। কোনরকম চালাকি করলে হাড়ে হাড়ে তার ফল টের পাবে।'

'হাত-মুখ ধোয়ার কি ব্যবস্থা?' প্রশ্ন করল রানা।

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম।' দরজার বাইরে কোথাও একটা সুইচ টিপল বোধহয় সে, সেলের পিছন দিকের খানিকটা দেয়াল সরে ছোট একটা অ্যালকোভ দেখা দিল। পরক্ষণে দড়াম করে লেগে গেল দরজা। তালা লাগানোর শব্দ শোনা গেল।

উঁকি দিয়ে অ্যালকোভটা দেখল রানা। একটা ওয়াশবেসিন, শাওয়ার, তোয়ালে আর কমোড, এই হচ্ছে ভেতরের সাজ-সরঞ্জাম। 'চলো, পরিষ্কার হয়ে নেয়া যাক।' শেভিং কিট নেই, কাজেই ওকে কেবল গোসল করেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। রোজালিন বের হতে দুই ট্রের অরনেট কভার সরাল রানা। সত্যিই স্পেশাল।

প্লেট ভর্তি ধূমায়িত বীফ, ডিম, সসেজ, প্রচুর টোস্ট, লেয়ার্ড অভ মারকাল্ডির প্রতীক আঁকা বড় এক চায়না বাটি ভর্তি বাটার ও মারমালেড এবং রূপার পট ভর্তি পর্যাপ্ত কফি। নিজের ট্রে ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটি।

'আমি খেতে পারব না। গলা দিয়ে নামবে না।'

বাহু ধরে ওকে নিজের দিকে ঘোরাল রানা। 'এতক্ষণ তোমাকে কি বোঝালাম আমি? একটু আগের সাহস কোথায় গেল তোমার? বলেছি তো সময়মত মুক্তির

একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলব আমি, কেন ঘাবড়াচ্ছ! তুমি ভয় পেলে তোমার চাচা খুশি হবে, তাই চাইছে পাগলটা, কেন বোঝো না? ভয় পেলেও চেপে রাখো মনে, খেয়ে নাও। নইলে পরে শক্তি পাবে না। এসো, মুক্তির পথ বের করার চিন্তা আমাকে করতে দাও।'

বলল বটে, কিন্তু কি করে যে মুক্তি আসবে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। কেবল অভিজ্ঞতা থেকে জানে, শুভর কাছে অশুভর সবসময়ই হার হয়। আজও যে শেষ পর্যন্ত লেয়ার্ডের পরাজয় ঘটবে, তাতে মনে সন্দেহ নেই রানার। কেবল জানে না সেটা কি ভাবে।

'বেশ,' বলে করুণ হাসি হাসল মেয়েটি। 'এসো তাহলে।'

খাওয়ার সময় দেখা গেল রানা নিজেই গিলতে পারছে না, আটকে যাচ্ছে গলায়। প্রচুর চিনি মেশানো কাপের পর কাপ কফির সাথে যতটা পারল ধুয়ে নামাল ও নিচে। খেতে হবে, শক্তি জমা রাখতে হবে, নইলে পরে এনার্জি পাওয়া যাবে না। রোজালিনও ওর পথ অনুসরণ করল।

রানা ভরপেট খেয়ে শুয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। ভাবছে। এখন থেকে প্রতিটি মুর্হূত ওকে সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে, নিজেকে শোনাচ্ছে মনে মনে। নিজের চারপাশে কখন কি ঘটে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে, উন্মাদটার প্ল্যান, অথবা অ্যাকশনের কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক চোখে পড়ামাত্র যাতে সুযোগটা নেয়া যায়। অবশ্য যদি তেমনটা ঘটে।

ক'টা বাজে জানার উপায় নেই, তবে ওর অনুমান দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘনিয়ে এসেছে সাইমুরের অপকর্মের ডেডলাইন। ভাবতে না ভাবতে দল নিয়ে পিটার হাজির। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই ট্রেতে গুছিয়ে রাখা ছুরি-কাঁটা চামচগুলো দেখল সে, তারপর ইশারায় বের হতে বলল ওদের। প্যাসেজ ধরে এগোল রানা ও রোজালিন। পিটার সামনে, অন্যরা পিছনে।

সরু প্যাসেজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া এক করিডরে পড়ল ওরা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে দাঁড়াল এক বন্ধ ফায়ার ডোরের সামনে। ওটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল পিটার, এগোবার নির্দেশ দিল। পিছনে মেয়েটির দম আটকে যাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। ধাক্কা ও নিজেও কম খায়নি সামনের দৃশ্য দেখে। সুবিশাল এক হ্যাঙ্গারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা–কাল এখানে পৌঁছে এটাকেই দেখেছে রানা বাইরে থেকে।

এত উঁচু, মনে হয় ভেতরে দশতলা কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক ধরে যাবে বুঝি অনায়াসে। সামান্য আওয়াজও প্রতিধ্বনি তোলে ভেতরে। বাতাসে তেল আর রাবারের গন্ধ। ভেতরে দেখার মত দৃশ্য আরও আছে, এবং সেটাই আসল। হ্যাঙ্গারের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দানবীয় আকৃতির প্রকাণ্ড এক প্লেন। আকাশ সমান উঁচু রোলার চালিত দরজার দিকে মুখ, হলুদ একটা ট্রাক্টর ওটাকে টো করার জন্যে তৈরি।

দেখামাত্র আকাশ দানবটাকে চিনল মাসুদ রানা। ওটা লকহীড-জর্জিয়া সি-১৪, স্টারলিফটার। আমেরিকান স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট বিমান-দেহ একশো বত্রিশ ফুট দীর্ঘ, দুই উইঙের পরিধি একশো চুয়াল্লিশ ফুট। মাটি থেকে নাকের উচ্চতা

একটা চারতলা বাড়ি সমান, প্রায় চল্লিশ ফুট। এমনকি হ্যাঙ্গারের বিশালত্ব পর্যন্ত ম্লান হয়ে গেছে ওটার উপস্থিতির কাছে।

টেইলে পেইন্ট করা আছে সাদা, লাল ও হলুদ রঙের ফ্রেঞ্চ আর্মি ডি ল'এয়ার ইনসিগনিয়া। ফিউজিলাজের পিছনদিকের এক জায়গায় অ্যালডান অ্যারোস্পেস শব্দ দুটোও লেখা রয়েছে। পিছনের র‍্যাম্পের দিকে নজর দিল রানা। হাইড্রলিক শক্তির সাহায্যে ওঠানো-নামানো হয় ওটা। লোডিঙ-আনলোডিঙ হয় ও পথে মাটিতে বা শূন্যে, দুই জায়গাতেই। ট্যাঙ্ক, সামরিক যান এমনকি হেলিকপ্টার পর্যন্ত ওখান দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যায় পেটের ভেতরে।

'ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার রানা,' ওর কনুইয়ের কাছ থেকে বলে উঠল রজার সাইমুর। 'ওটা স্টারলিফটার ঃ নামটা চমৎকার, কি বলেন? স্পেশালি মডিফাইড। ভেতরে চলুন, আরও অনেক অবাক করা জিনিস দেখতে পাবেন।'

হ্যাঙ্গারের সামনের দিক থেকে ভারী লোহার গেট গড়াবার আওয়াজ উঠল। পিটার হাতের পিস্তল দিয়ে মৃদু গুঁতো লাগাল রানার পিঠে। প্লেনে চড়ল ওরা বিজ্ঞানীকে অনুসরণ করে। ফ্লাইট ডেকের জানালা দিয়ে ভেতরে কাজে ব্যস্ত ক্রুদের দেখতে পেল রানা—প্রি টেক্‌অফ চেক করছে লোকগুলো। পিটারের দুই সঙ্গী থেমে গেল দোরগোড়ায়, অন্য দু'জন নেতার সাথে অনুসরণ করল রানা ও রোজমেরিকে।

ফিউজিলাজের ভেতরে এক নজর চোখ বুলিয়েই রানা বুঝল, বিমানটা রজারের অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করেছে লকহীড কোম্পানি। প্রথমে একটা চমৎকার ডেকোরেশন করা খুদে ক্যান্টিন-কাম-বারে নিয়ে এল ওদের লেয়ার্ড। ভেতরে তিনটে ছোট গোল টেবিল আছে, প্রতিটিতে চারজন করে বসার ব্যবস্থা। মেঝের পুরু কার্পেটে পা ডুবে যায়। সামনের গ্যালিতে দুজন লোক রান্নার আয়োজন করছে মনে হলো।

'আমি দুঃখিত যে এখানে আমাদের সাথে বসে খানাপিনার সুযোগ হবে না আপনাদের কারও,' বলে হাসিমুখে প্রথমে রানা, পরে ভাইঝির দিকে তাকাল বিজ্ঞানী। 'আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটতে যাচ্ছে, সে সব নিয়ে প্রায়ই আলোচনার দরকার পড়বে আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমি চাই না সে সময় আপনারা এখানে বসে আমাদের কথা গিলুন। তবে আপনারা যাতে খিদে-তেষ্টায় কষ্ট না পান, সেদিকে কড়া নজর থাকবে আমার, তা নিয়ে চিন্তা নেই।'

ফিউজিলাজের পিছনদিকে যাওয়ার পাইডিং দরজা ইঙ্গিত করল লোকটা। 'ওই দরজার ওপাশে আছে আমার প্রজেক্টের যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির সেকশন। খুব স্পর্শকাতর। ওখান দিয়ে হাঁটার সময় একটু সাবধানে পা ফেলবেন দয়া করে। চলুন।'

দরজার ওপাশে কার্পেট নেই, ফিউজিলাজও বেশ সরু। প্রায় চল্লিশ ফুট দীর্ঘ এ সেকশন। দু'দিকের দেয়াল ডেক থেকে আপার বাল্কহেড পর্যন্ত হাই কেবিনেট ও অসংখ্য মেটাল ইউনিটে ঢাকা। ইলেক্ট্রনিক ইকুইপমেন্টে ঠাসা সেকশনের পুরো দৈর্ঘ্য। দুই দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে সাদা কভারল পরা সাইমুরের দুই এক্সপার্ট। জটিল কনসোলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে।

'বিটোফেনের ফিফথ্ বাজাও দেখি, বাছা!' তাদের একজনের উদ্দেশে বলল রানা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল বিজ্ঞানী। এমন সিরিয়াস সময় ওর রসিকতা পছন্দ হয়নি। পরক্ষণে পাশ থেকে পালে পিটারের মাঝারি ওজনের এক থাবড়া খেয়ে প্রায় শুয়ে পড়ার দশা হলো রানার। 'শাট্ ইয়ের গব!' হুমকি দিল লোকটা। ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল ওকে।

ইলেক্ট্রনিক গুহার শেষ মাথায় আরেক পাইডিঙ দরজা। ওটা যে বুলেট প্রুফ, দেখেই বুঝল রানার অভিজ্ঞ চোখ। ফায়ার প্রুফও বটে। পাইডিং ল্যাচে হাত রেখে ঘুরল সাইমুর। 'এটা আমার অফিস। একান্ত ব্যক্তিগত ভুবন,' টান মেরে একপাশে সরিয়ে দিল সে দরজা। 'আসুন।'

ভেতরে পা রাখল রানা। সামনে তাকিয়ে বুঝল, এয়ারক্র্যাফটের প্রায় অর্ধেকটা অতিক্রম করে এসেছে ওরা। সাইমুরের অফিসরুমে ঢুকতেই গোল একটা ফাঁকা স্পেস, মাথার ওপর থেকে আলো ছড়াচ্ছে শেডেড বালব্। সবুজ আলো। 'আমার অপারেশনের নার্ভ সেন্টার এটা,' ঘোষণা করল বিজ্ঞানী।

দুই হ্যাচওয়ের মাঝের জায়গাটা লম্বায় কম করেও বিশ ফুট হবে। দুই দিকে তিনটে করে ডিম সাইজ জানালা, সবগুলোর ব্লাইন্ড নামানো এ মুহূর্তে। মাঝে কয়েক ফুট চওড়া পথের দু'পাশে আধখানা চাঁদের মত দুটো বড় ডেস্ক, তার প্রায় পুরো টপ জুড়ে আছে জটিল সমস্ত ইলেক্ট্রনিক প্যানেল। প্রতিটা ডেস্কের পিছনে, সামনের দিকে মুখ করে আছে পুরু চামড়া মোড়া তিনটে করে সুইভেল চেয়ার। ওগুলোর পিছনে আরও চারটা করে চেয়ার, গদিমোড়া, তবে সাধারণ। যেন দর্শকদের জন্যে রাখা হয়েছে ওগুলো। সবকিছু মেঝের সাথে ফিক্স করা।

পিছনের হ্যাচওয়ের পাশে আরেকটা ছোট হ্যাচওয়ের আউটলাইন আঁকা আছে টকটকে লাল রঙে। বন্ধ। ওটার ওপরে বড় হাতের অক্ষরে স্টেনসিল করা আছে একটা বাক্য: DO NOT ENTER IF THE RED LIGHT IS ON. ওই দরজার পাশ দিয়ে পিছনে যাওয়ার সরু প্যাসেজ আছে একটা।

'এবার বসা যেতে পারে,' বলল লেয়ার্ড।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে দুই মস্ত থাবায় রানার বাহু চেপে ধরল পিটার। সঙ্গে আসা অন্য দুই গার্ড রোজালিনের দিকে এগোল।

'আপনি আমার বাঁদিকে বসবেন, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'ওটা মের সীট। আপনার অসহযোগিতার জন্যে শেষ পর্যন্ত ওকেই যেতে হলো প্যাট্রিকের ব্যবস্থা করতে, তাই সঙ্গে থাকতে পারল না বেচারী। যা হোক, বসুন। এমনিতেও এ সময়ে ওকে সঙ্গে রাখার ইচ্ছে ছিল না আমার।' আনমনা হয়ে উঠল লোকটা। প্রায় বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু এতক্ষণে তো ওর ফিরে আসার কথা। আসছে না কেন?'

'দুটো কারণ থাকতে পারে,' চট্ করে বলে উঠল ও। 'হয় পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, নইলে আরগুয়েলোর সাথে সে-ও সাগরে পড়েছে। হাঙরের পেটে গেছে।'

ঘোলা চোখে তাকাল রজার সাইমুর। তবে পাল্টা কিছু বলল না। ডানদিকের

ডেস্কের বাঁ দিকের সুইভেল চেয়ারে বসানো হলো রানাকে, সাধারণ সীট বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। মাঝের চেয়ারে বসল বিজ্ঞানী। বসার সময় রানার দিকের কোটের প্রান্ত খানিকটা সরে গেল তার, ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রাতে দেখা সেই কোল্ট পাইথন-হোলস্টার থেকে মাথা বের করে আছে। খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, পরক্ষণে চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল পিটার ওর হাত বাঁধার আয়োজন করছে দেখে। হাত চেয়ারের পিছনে টেনে নিয়ে ওয়েবিং বেল্ট দিয়ে দুই কব্জি বেশ শক্ত করে বাঁধল লোকটা। এরপর আরও দুই বেল্ট দিয়ে বুক-বাহু বাঁধা হলো চেয়ারের সাথে। পা ছাড়া আর কিছু নাড়ানোর উপায়ই রইল না ওর। রোজালিনকে বসানো হয়েছে ওপাশের ডেস্কের সামনে। ওকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে ব্যাটারা।

নিজের চেয়ারে বসে সীট বেল্ট বাঁধল লেয়ার্ড, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল সামনের কনসোল অ্যাডজাস্ট করতে। কয়েক সেকেন্ড পেশাদারী দক্ষতার সাথে নেচে বেড়াল তার দুই হাতের আট আঙুল, কনসোলের অনেকগুলো পিন-লাইট আর ভিজুয়াল ইউনিট জ্বলে উঠতে শুরু করল এক এক করে। ডেস্কের মাঝখান থেকে সাপের মত উঠে আসা এক অ্যাডজাস্টেবল্ মাইক্রোফোনের 'স্পীক' লেখা বাটন টিপে দিল সে এরপর।

কনসোলের ওপরের দিকে ছয়টা ডিজিটাল ঘড়ি চলছে একমনে, সবগুলোর নিচে টাইম জোন আর জায়গার নাম লেখা। সাইমুরের ছয় টার্গেটের সময় নির্দেশ করছে ওগুলো। ব্রিটিশ টাইম দেখল রানা-বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

পাশের ডেস্কের দিকে তাকিয়ে ভীষণ অবাক হলো ও। রোজমেরিকে মাঝে বসিয়ে যে দুই গার্ড ওর দু'পাশে বসেছে, তারা আসলে অন্য কিছু। সাইমুরের মত ঝুঁকে সামনের কনসোলে কাজ করছে নিপুণ দক্ষতার সাথে। ট্রেইনড টেকনিশিয়ান ব্যাটারা, চরম বিস্ময়ের সাথে ভাবল ও। এমন সময় মৃদু এক টান অনুভব করল, দুলে উঠে খুবই ধীরগতিতে হ্যাঙ্গারের গেটের দিকে রওনা হলো স্টারলিফটার। হলুদ ট্রাক্টর টেনে নিয়ে চলেছে।

হাত তুলে রানার বাঁ দিকের ব্লাইন্ড টানা জানালা দেখিয়ে হাসল রজার সাইমুর। 'আমি কথা দিয়েছিলাম আজকের ফ্লাইটে রিঙসাইড সীটের ব্যবস্থা করব আপনার জন্যে, মিস্টার রানা। করেছি। আকাশে উঠে ব্লাইন্ড তুলে দেব, তখন বাইরের সবই দেখতে পাবেন।'

পিছনের সরু প্যাসেজ ধরে পিটারকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে তার দিকে ফিরল রানা। 'ওদিকে কি আছে, তা তো দেখা হলো না!'

'ওদিকে?' শব্দ করে হেসে উঠল বিজ্ঞানী। 'ওদিকে আছে এক্সিটওয়ে, বা র‍্যাম্প, দেখেননি ছবিতে? ও পথে ট্যাঙ্ক-গাড়ি-চপার স্টারলিফটারে ওঠানো-নামানো হয়, প্যারাশুট ট্রুপস্ জাম্প করে, আরও কত কিছু হয়। একবার ভেবেছিলাম ওই পথে জাম্প করতে বাধ্য করব আপনাকে, প্যারাশুট ছাড়া অবশ্য,' পাখির মত চকিত চাউনি দিয়ে হাসল লোকটা। 'পরে অন্য এক পথ বের করেছি ভেবেচিন্তে।'

'সেটা কোন্ পথ?' প্রশ্নটা শুনল ও কেবল, উত্তর কানে পৌঁছল না।

স্টারলিফটারের প্রচণ্ড শক্তিশালী চার প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি টার্বো ফ্যানের প্রথমটা হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল, কাঁপতে শুরু করল আকাশ-দানব, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন। সামান্য বিরতি দিয়ে একে একে অন্য তিনটেও স্টার্ট নিল অল্প সময়ের মধ্যে।

'সে সব এখন থাক্,' গলা চড়িয়ে উত্তরটা পুনরাবৃত্তি করল বিজ্ঞানী। 'পরে শুভ সময়ে জানাব।'

ফিরে এসে মনিবের উদ্দেশে নড করল পিটার, কিছু একটা মেসেজ জানাল হয়তো। জবাবে মাথা ঝাঁকাল সে সন্তুষ্ট চেহারায়। 'গুড!'

প্রথমে কিছু সময় আলাদাভাবে সনাক্ত করা গেল চার এঞ্জিনের গর্জন, একটু পর সে উপায় রইল না। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হেলেদুলে ট্যাক্সিওয়ের দিকে এগোতে শুরু করল স্টারলিফটার। মেইন এন্ট্রান্সের কাছেই কোথাও একটা ধাতব ক্লিক্ শব্দ হলো, ফ্লাইট ডেকের সাথে যোগাযোগ চালু হলো সাইমুরের অফিসের।

'ক্যাপ্টেন বলছি অ্যালডান ফাইভ-সিক্সের সমস্ত ক্রু ও যাত্রীদের,' একটা মোটা কণ্ঠ বলে উঠল ঝরঝরে ইংরেজিতে। 'দয়া করে যার যার সীট বেল্ট বেঁধে ফেলুন প্রত্যেকে। সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন। অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশে উড়তে যাচ্ছি আমরা। ধন্যবাদ।'

ব্রিটিশ সময় নির্দেশক ঘড়ি ১১:৫৪ মিনিটে প্রায় পৌঁছে গেছে। ট্যাক্সিইং শেষ করে থামল প্লেন, এঞ্জিনের সম্মিলিত আওয়াজ মুহূর্তের জন্যে একটু চাপা শোনাল, পরক্ষণে তুঙ্গে উঠে গেল। নড়ে উঠেই একযোগে চার এঞ্জিনের ৮৪ হাজার পাউন্ড স্ট্যাটিক থ্রাস্টের ধাক্কায় পলকে ঝড়ের গতিতে দৌড় শুরু করল, সীটের নরম গদিতে প্রায় সেঁধিয়ে গেল রানা আর সবার মত।

এক সময় লাফঝাঁপ থেমে গেল ওটার, সহজ-সাবলীলভাবে মাটি ছাড়ল সামনের হুইল, তার একটুপর পিছনেরগুলোও। তেরছা রেখা ধরে সাঁ-সাঁ করে উঠে যেতে থাকল আকাশ-দানব। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একজোড়া ফোম-প্যাডেড হেডফোন বের করে রানার কানে পরিয়ে দিল রজার সাইমুর। 'এটা দিয়ে এখন থেকে সবকিছু শুনতে পাবেন আপনি। আমার সব কথা, ওদের সব কথা—সব স্পষ্ট কানে যাবে আপনার।'

ঘড়ি দেখল লোকটা। রানাও তাকাল। দু'মিনিট বাকি বারোটা বাজতে। 'সময় হয়েছে,' খিক্ খিক্ করে হাসল উন্মাদ বিজ্ঞানী। 'এখনই শুনতে পাবেন আমার টেররিস্ট গ্রুপগুলোর রিপোর্টিং।'

লন্ডন।

স্টারলিফটার আকাশে ওড়ার আধ ঘণ্টা আগের কথা।

ভীষণ ব্যস্ত ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো। এর মধ্যে তাঁর জানা হয়ে গেছে গতরাতের ফোনটা কোত্থেকে করেছিল মাসুদ রানা। ওর ফ্রান্স যাওয়ার সাথে রজার সাইমুরের কোন সংযোগ আছে কি না, তাও জেনে গেছেন খোঁজ-খবর করে। অ্যালডান অ্যারোস্পেস (ফ্রান্স) ইনকর্পোরেটেডের খবরও

অজানা নেই।

প্যারিস থেকে একের পর এক কল রিসিভ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। নানান পুলিস আর সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের তরফ থেকে প্যারিস হয়ে আসছে কলগুলো। লংফেলোর পাশে নীরবে পাইপ টেনে চলেছেন আরেক বৃদ্ধ, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান–মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান।

কেবল টানছেনই, ওটা যে নিভে গেছে বহু আগেই, সেদিকে খেয়াল নেই। ওটা তাঁর ভেতরের উদ্বেগের লক্ষণ। কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে আছে। ভীষণরকম অন্যমনস্ক। ঘুরে তাঁকে দেখলেন লংফেলো. মুখ বাড়িয়ে নিচু কণ্ঠে কিছু বললেন।

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। গম্ভীর, ভরাট গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে দেরি হয়ে গেছে। সময়মত হচ্ছে না কিছুই। তবু, চেষ্টা করে দেখো।'

লাল টেলিফোন সেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লংফেলো। দেড় মিনিটের মাথায় ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস-SDECE-র প্রধানের সাথে সংযোগ চালু হতে কথা বলতে শুরু করলেন একনাগাড়ে। সার্ভিসের চার অপারেটর ও এক গাড়ি আর্মড পুলিস যখন তাদের চীফের নির্দেশে পারপিগনান এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাশূন্যে ডানা মেলেছে সাইমুরের স্টারলিফটার।

প্যারিসের ষাট মাইল দূরে, অর্লিয়ন্স শহরের কাছের সেইন্ট-লরেন্স-দ-ইয়ক্স এক, দুই ও তিন নামে পরিচিত নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের মাটির নিচের বিশাল কমপ্লেক্স। চার কর্মচারী রুটিন কাজ ছেড়ে হঠাৎ করে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল এখানে, প্রায় একই সময়। আগে বহুবার মহড়া দেয়া আছে তাদের এ ব্যাপারে।

স্থানীয় সময় বারোটা পঞ্চাশের দিকে প্ল্যান্ট টু-র দুই টারবাইন টেন্ডার নিজেদের পোস্ট ছেড়ে সরে এল। এক মেইন্টেন্যান্স কর্মী বসে তাস খেলছিল অন্য তিন সহকর্মীর সাথে, কাজের কথা বলে ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়ল সে। প্ল্যান্টের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম বহাল রাখার কাজ তার। ওদিকে পঞ্চাশ ফুট নিচে, মেইন কন্ট্রোল রুমের গেটের নিরাপত্তা কর্মী ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে শুরু করেছে।

প্রথম তিনজন নিচে নেমে এল। দু'পাশের অজস্র পাইপ-লাইনের মাঝের সরু প্যাসেজ ধরে সেদিকে এগোচ্ছে। কথা নেই কারও মুখে। হাঁটার মধ্যে এখানে-ওখানে থেমে পাইপের আড়ালে-আবডালে স্কচ টেপ দিয়ে আটকে রাখা প্রয়োজনীয় হালকা অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিচ্ছে। ফরাসী সময় একটা বাজার দু'মিনিট বাকি থাকতে কন্ট্রোল রুমের বাইরে, এলিভেটর শ্যাফটের কাছের ইমার্জেন্সি স্টেয়ারের মাথায় দলের অন্য সঙ্গী, নিরাপত্তা কর্মীর সাথে মিলিত হলো তারা। একটা বাজতে এক মিনিট বাকি তখন।

ভল্টের মত সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুরক্ষিত রুমের ভেতরে আধডজন এক্সপার্ট কন্ট্রোলের অজস্র ডায়ালের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। পাওয়ারের প্রবাহে কোন অপ্রত্যাশিত ওঠা-নামা বা পরিবর্তন ঘটতে দেখলে সময়মত সামাল দেবে তারা। রুটিন কাজ। ভীষণ পুরু লোহার বড় মেইন ডোর খুলে যাওয়ার ঘটাং শব্দে তাদের একজন ঘুরল, বাইরের নিরাপত্তা কর্মীকে ভেতরে ঢুকতে দেখে চোখ

কোঁচকাল। 'অ্যাই, তুমি কেন এখানে?' চেঁচিয়ে বলল সে। 'জানো না এখানে আসার অনুমতি···' কথা শেষ করতে পারল না, গলায় আটকে গেছে লোকটার হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল দেখে। লোলুপ দৃষ্টিতে তারই বুকের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর জিনিসটা।

আরও তিনজন ঢুকল ভেতরে। একজনের হাতে ভাঁজ করা বাঁটের হেকলার অ্যান্ড কচ সাব-মেশিনগান দেখা গেল, রুমের হতভম্ব আর সবার ওপর দিকে এক চক্কর ঘুরে এল ওটা। 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও সবাই,' সহজ কণ্ঠে বলল প্রথমজন। 'সরে এসো ইকুইপমেন্টের সামনে থেকে, এখনই। এক নির্দেশ দু'বার দেব না, পরের বার সোজা গুলি করব।'

ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেল ছয় এক্সপার্টের, ক্লিপবোর্ড-কলম ফেলে দু'হাত মাথার পিছনে বেঁধে দাঁড়াল তারা। পিছিয়ে গেল মনিটরিং প্যানেলের সামনে থেকে। প্রথমজনের ধমক আর দ্বিতীয়জনের সাব-মেশিনগান লোকগুলোকে এতই সম্মোহিত করে ফেলেছে, ওদের পাশ ঘেঁষে যে আরও দু'জন ভেতরে ঢুকে পড়েছে, সেদিকে নজরই পড়েনি কারও। রুমের দুই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল লোকদুটো, বুড়ো আঙুল তুলে ওকে ইশারা করল সতীর্থদের।

কমিউনিকেশনস্ কেবল কেটে বাইরের পৃথিবীর সাথে ভেতরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাদের একজন, অন্যজন অফ করে দিয়েছে এক্সটার্নাল কন্ট্রোল ওভাররাইড সুইচ। প্রথম দু'জন ছয় এক্সপার্টকে অস্ত্রের মুখে মেইন দরজায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল। বলির পাঁঠার মত কাঁপছে লোকগুলো। এখনই যে মরতে হবে, তাতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু মিথ্যে প্রমাণ হলো তা।

সিকিউরিটি গার্ড বলে পরিচিত লোকটা বলে উঠল, 'তোমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই, আমরা এখানে অহেতুক রক্তপাত ঘটাতে চাই না। তোমরা তোমাদের অথরিটিকে জানাও, এই প্রজেক্ট কেন দখল করেছি আমরা, কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে বাইরে থেকে। তার আগে যদি কর্তৃপক্ষ কোন রকম অ্যাকশন নেয়ার চেষ্টা করে, কূলিং সিস্টেম অফ করে দেব আমরা। চায়না সিনড্রোমের আক্রমণে উজাড় হয়ে যাবে মানুষ-জন। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল প্রত্যেকে। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। পিছনে দড়াম করে লেগে গেল ভারী দরজা, ভেতর থেকে লাগিয়ে দেয়া হলো চার চারটে সেফটি লক্। দরজার চোখ বরাবর উচ্চতায় বসানো চৌকো রিইনফোর্সড কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকাল দলের নেতা, গার্ড। দেখল গ্যালারি ধরে সারবেঁধে হেঁটে চলে যাচ্ছে এক্সপার্টরা।

সঙ্গী দু'জনের একজন ক্যানভাস হ্যাভারস্যাকে করে নিয়ে আসা অপারেশনের এ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, ট্রান্সিভার বের করল, অন্যজন ওটার প্লাগ ঢুকিয়ে দিল ওয়াল সকেটে। লীডার ছোট বাক্সের মত দেখতে ট্রান্সিভারের সুইচ অন করে দিতেই একটা লাল আলো জ্বলে উঠল ওটার গায়ে দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে উঠল আলোটা। এবার 'ট্রান্সমিট' লেখা সুইচ টিপল

সে, তারপর বাক্সটা মুখের কাছে ধরে দৃঢ়স্বরে বলল, 'নাম্বার থ্রী, ওয়ার।'

হেডফোনের মাধ্যমে শব্দ তিনটে একদম স্পষ্ট শুনতে পেল মাসুদ রানা। বেশ ভারী গলায় বলল বক্তা: নাম্বার থ্রী, ওয়ার।

'সেইন্ট-লরেন্স-দ-ইয়ক্স ওটা,' বিজয়ের গর্বে উদ্ভাসিত হাসিমুখে পাখি-নড করল রজার সাইমুর। ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'আমার ফ্রেঞ্চ টার্গেট।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আরেকটা গলা শুনতে পেল রানা: নাম্বার ওয়ান, ওয়ার।

'ইংল্যান্ড,' কনসোলের ওপর ঝুঁকে বসল বিজ্ঞানী। সামনে শোয়ানো এক ক্লিপবোর্ডে দ্বিতীয় টিক্ চিহ্ন আঁকল।

'নাম্বার ফাইভ, ওয়ার।'

'নাম্বার ফোর, ওয়ার।'

'নাম্বার টু, ওয়ার।'

মেসেজ তিনটে পরপর এল, প্রায় বিরতিহীনভাবে। রানার মনে হলো ওর মাথার মধ্যে বসে কথা বলছে যেন অজ্ঞাত মানুষগুলো। আর মাত্র একটা মেসেজ আসা বাকি। সাইমুরকে দেখল ঘন ঘন দু'হাত মুঠো করছে আর খুলছে। শেষটার কনফার্মেশন আসতে দেরি হচ্ছে দেখে টেনশনে পড়ে গেছে হয়তো। চেহারা কঠোর। ভালই জানে, এ মুহূর্তে যে ভয়ঙ্কর খেলা সে শুরু করেছে, তার থেকে ফেরার কোন পথ নেই। অস্থির হয়ে উঠল সে, কনসোলের কিনারায় আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে শুরু করল।

তারপর, যেন এক যুগ পর শোনা গেল শেষ বার্তা: নাম্বার সিক্স, ওয়ার।

তিড়িং করে ছাগলের বাচ্চার মত লাফিয়ে উঠল উন্মাদ বিজ্ঞানী। 'ব্যস্! শেষ!' মাথা দোলাতে লাগল ভীষণ উত্তেজনায়। সুপ্ত লাভার টুকরো দুটো অকস্মাৎ জ্যান্ত হয়ে নড়াচড়া শুরু করেছে কোটরের মধ্যে। পরিষ্কার বদ্ধ উন্মাদের চাউনি।

'এইবার!' নিয়ন্ত্রণহীন গলায় বলে উঠল সে। 'এইবার বিশ্বকে আমার মেসেজ জানাব আমি। দেখলেন তো, যেভাবে চেয়েছি, ঠিক সেভাবেই ঘটেছে সব। পরিস্থিতি এখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, একমাত্র আমিই পারি ঠেকাতে। আর কেউ নয়। আর কেউ নয়, মাসুদ রানা। আমেরিকা-ইওরোপের সবখানে অজস্র মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটার প্ল্যান্ট করেছি আমি, ওগুলোর মাধ্যমে এখন প্রচার হবে আমার দাবি, বিভিন্ন ভাষায়। ইওরোপের সমস্ত দেশসহ এশিয়ান-ইস্টার্ন অঞ্চলের অনেক দেশ তা শুনতে পাবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের ব্রডকাস্টিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে লক্ করা আছে আমার ট্রান্সমিশন, আমি যখন বলতে শুরু করব, সব দেশের স্বাভাবিক ব্রডকাস্টিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যাবে, রেডিওতে কেবল আমার কথাই শুনবে বিশ্ববাসী। দেখুন।'

কনসোলের একটা ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল সে। একজোড়া সরু কাঁটা ধীরগতিতে ঘুরে এসে নিচের বড় হাতে লেখা VU-র ওপর স্থির হলো। 'আমার আল্টিমেটাম নিজের ভাষায় শুনতে পাবেন আপনি, মিস্টার রানা। বাংলা ভাষায়। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি, কাজেই ওটাকেও ছাড়িনি।'

সামনে ঝুঁকল সাইমুর। দুটো সুইচ অন করে আরেক লাল বাটনে টিপ দিতে গিয়ে থেমে গেল কি ভেবে। ঘুরে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল–আত্মবিশ্বাসের সাথে। 'আরেকটা কথা, আমার বলার সময় যে গলাটা আপনি শুনবেন, সবাই শুনবে, সেটা কিন্তু আমার নয়।' রানাকে চোখ কোঁচকাতে দেখে সন্তুষ্ট হলো সে। 'হ্যাঁ, যদিও আমার মুখ দিয়েই বের হবে কথাগুলো, কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে ওটা পুরুষের গলা। সবাই জানবে মেয়ের গলা।

'আমারই এক কোম্পানির তৈরি ইঞ্জিনিয়াস ডিভাইস ব্যাপারটা ঘটাবে। ওটার নাম রেখেছি আমি "ইলেক্ট্রনিক হ্যান্ডকারচিফ"। ওটা দিয়ে আপনিও আপনার কণ্ঠস্বর আমূল বদলে ফেলতে পারবেন, মিস্টার রানা।' হাসি একটু একটু করে দুই কানে গিয়ে ঠেকল উন্মাদটার। পাখি-নড করল। 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনুন তাহলে।'

শুরু করে দিল রজার সাইমুর। মাসুদ রানা শুনছে এক মেয়ের চমৎকার, সম্মোহনী কণ্ঠ। বক্তব্য পরিষ্কার, উচ্চারণ ঝরঝরে। শুরুটা তীক্ষ্ণ, হুকুমদারী, তারপর কিছুটা শান্ত গলায় বলে চলল লোকটা। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো বক্তব্য। শুনতে শুনতে ওর দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল–পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল ভীষণভাবে। রীতিমত অসুস্থ বোধ করল ও।

এক ঘণ্টা পর। লন্ডনের হোয়াইটহল ক্যাবিনেট অফিস ব্রিফিঙের আন্ডারগ্রাউন্ড রূমে দেশের সমস্ত নিরাপত্তারক্ষক সংস্থার মাথা হাজির। গোপন জাতীয় দুর্যোগ কমিটি বা কোবরার জরুরী বৈঠক বসেছে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে। বিএসএস চীফ লংফেলো আর বিসিআই চীফ রাহাত খানও আছেন ওখানে। সবাই স্তম্ভিত। যেন ঝোড়ো কাক একেকজন, এমন চেহারা।

একটু আগে রেকর্ড করা ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অবিশ্বাস্য আল্টিমেটাম সপ্তম দফার মত শুনছে সবাই। এক মেয়েকণ্ঠ বলে চলেছে:

'বিশ্ববাসী! আপনারা সবাই কাজ বন্ধ করুন। এখনই। নীরবে আমার কথা শুনুন। আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি খুব জরুরী এক বার্তা নিয়ে এসেছি। অতএব কাজ বন্ধ করুন, চুপচাপ কান পেতে আমার কথা শুনুন। বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি আর যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রধান, মন্ত্রী, আমলা ও উঁচু পদের অফিসাররা শুনুন। বিষয়টাকে কেউ হাল্কা করে দেখবেন না, কারণ এর ওপর নির্ভর করছে আপনাদের সবার জীবন-মৃত্যু।

'আজ ব্রিটিশ সামার টাইম ঠিক বারোটা, অর্থাৎ জিএমটি প্লাস এক ঘণ্টার সময় আমার ছয় গ্রুপ এক্সপার্ট সংশ্লিষ্ট চারটি দেশের ছয়টা পারমাণবিক প্রকল্পের মেইন কন্ট্রোল রূম দখল করে নিয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে···' গড়গড় করে সব কটা নাম ঠিকানা বলে গেল মহিলা-কণ্ঠ। 'এ প্রসঙ্গে আপনাদের দুটো ব্যাপার খুব স্পষ্ট করে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি আমি। একটা হচ্ছে, যারা এই দখল প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে, সোজা কথায় তারা সবাই ফ্যানাটিক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মরতেও পিছপা হবে না। অন্যটা হচ্ছে, ওই ছয় কন্ট্রোল রূমের সাথে বাইরের পৃথিবীর সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিয়েছে ওরা। একমাত্র আমার

সাথে ছাড়া আর কারও সাথে যোগাযোগ নেই ওদের। এবং ওরা আমার কথায় চলবে।

'ওদের ওপর আমার পরিষ্কার নির্দেশ আছে, যদি কোন সরকার সেনাবাহিনী বা অন্য কোন বাহিনীর সাহায্যে প্রকল্পগুলো মুক্ত করার জন্যে কোনও রকম অভিযান চালানোর চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্টর কোরের কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দেবে ওরা। একযোগে ছয় দলই। যদি সেরকম কিছু ঘটে যায় অর্থাৎ আমার লোকেরা কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দিতে বাধ্য হয়, ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বিশ্বে। চায়নাসিনড্রোমের অসহায় শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে।

'কূলিঙ সিস্টেম অফ হয়ে গেলে রিঅ্যাক্টরের কোর ভীষণরকম উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, মৃদু ভূমিকম্প ঘটবে, মেঘ ডাকার মত আওয়াজ হবে, তারপর মাটির তলায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ। কিন্তু মাটির তলায় থাকবে না ওসব, কোথাও না কোথাও দিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বে, বাতাসে ভেসে বেড়াতে শুরু করবে, এরই ফলে ঘটবে চায়না সিনড্রোমের উৎপত্তি।

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট চার দেশের সরকার আমার দাবি মেনে না নেয়, তাহলেও ঘটবে একই ব্যাপার। নির্দেশ দেয়া আছে, কাজেই দেরি করবে না ওরা, চব্বিশ ঘণ্টার পর এক মুহূর্ত দেরি না করে অফ করে দেবে সিস্টেম। মনে রাখবেন, ওরা ফ্যানাটিক, নিবেদিত প্রাণ। প্রয়োজনে এক সেকেন্ডও ইতস্তত করবে না মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

'মনে রাখবেন, আমার দাবি অগ্রাহ্য করার অর্থ হবে পৃথিবীর ধ্বংস ডেকে আনা। মাটির মানুষ-গবাদিপশু মরবে, গাছের পাখি মরবে, নদীর মাছ মরবে, জমি তার উর্বরাশক্তি হারাবে। এসবের ফল কি হবে, বিশ্ববাসীকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি আমি। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে আমার দাবি পূরণ করতে হবে।

'এবার আমার দাবি ও নির্দেশ মন দিয়ে শুনুন। প্রকল্পগুলোকে মুক্ত করে দেয়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের সম পরিমাণ মুক্তিপণ চাই আমি। পাঁচ শূন্য বিলিয়ন, বি ফর বিউগল। নগদ নয়, হীরে চাই—কাট জেম ডায়মন্ড, কারেন্ট দর, আজকের বাজার দর অনুযায়ী। লন্ডন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম আর আমেরিকার বাজার থেকে ওগুলো জোগাড় করতে হবে। বড় ন্যাভাল ফ্লোটেশন ব্যাগে ভাল করে, যত্নের সঙ্গে প্যাক করতে হবে হীরে, ব্যাগের সাথে সাধারণ ন্যাভাল বা আর্মি রিকভারী হূপ জুড়ে দিতে হবে মজবুত করে। তারপর ওটাকে এয়ারক্র্যাফটে করে বয়ে এনে আমার নির্দেশিত জায়গায় ড্রপ্ করতে হবে।'

কোথায় ফেলতে হবে, কত অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ, পরিষ্কার উচ্চারণে, থেমে থেমে তিনবার বলে গেল বক্তা, যেন বুঝতে কারও কোনও ভুল না হয়।

'ডায়মন্ড ডেলিভারি দেয়ার আগে ড্রপিং পয়েন্টের চতুর্দিকের পঞ্চাশ স্কোয়্যার মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ বা ভেসেল, কিছুই আসতে পারবে না, এবং ব্যাগ ড্রপ্ করে বহনকারী এয়ারক্র্যাফটকেও জোনের বাইরে চলে যেতে হবে। ডায়মন্ড হাতে না পাওয়া পর্যন্ত, শুধু হাতে পাওয়া নয়, ওগুলোর খাঁটিত্ব, দাম ইত্যাদি সব ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্ল্যান্টগুলো আমার দখলেই থাকবে।

আমার নিজস্ব এক্সপার্টদের দিয়ে কাজটা করাতে দু'ঘণ্টামত সময় লাগবে। যদি ডায়মন্ডের কোয়ালিটিতে কোন ফাঁক না থাকে, ড্রপিঙের তিন ঘণ্টার মধ্যে সব প্ল্যান্ট ছেড়ে চলে যাবে আমার লোকেরা।

'যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার দাবি পূরণ না হয়, যদি কোন পক্ষের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে কোনরকম অ্যাকশনে নামার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে বিনাদ্বিধায় হুমকি কার্যকর করবে আমার লোকেরা।

'আরেকবার স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার এই মেসেজকে কেউ গুরুত্বহীন মনে করবেন না। তাহলে বাকি বিশ্বকে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ, মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক ঘটনার সাক্ষী হতে হবে। এটা আমার প্রথম ও শেষ মেসেজ, এরপর আর যোগাযোগ করব না। মনে রাখবেন, পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে আপনাদের হাতে। কাজেই একটু তৎপর হোন, আমার দাবি পূরণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মেসেজ শেষ।'

প্রধানমন্ত্রী হ্যাম্পশায়ারে ছিলেন, খবর পেয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এসেই এই মীটিঙ ডেকেছেন। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও জার্মানি-ফ্যান্সের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে কথা হয়েছে আমার,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ওঁদের সাথে আমিও একমত, এই টেররিস্ট অ্যাকশনের কাছে আমরা সম্পূর্ণ অসহায়, কিছু করার নেই। মুক্তিপণের অঙ্ক বিশাল, অবিশ্বাস্য, তবু কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা সবাই। ডায়মন্ড সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিকেলের মধ্যেই প্যারিস পৌঁছে যাবে সব। ফ্রেঞ্চ এয়ারক্র্যাফট সময়মত ওগুলো নিয়ে ড্রপিঙ পয়েন্টে রওনা হবে। আপনারা জানেন, জায়গাটা ভূমধ্যসাগরে। সব যদি ঠিকঠাক থাকে, কাল ব্রিটিশ সময় সকাল ন'টায় ডায়মন্ড ড্রপ করা হবে।

'সমস্যা হচ্ছে, ওই সময় নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে সমস্ত জাহাজ, ভেসেলকে দূরে সরিয়ে রাখা নিয়ে। তবু, সেটাও সম্মিলিতভাবে দেখেছি আমরা। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। এই প্রথম আমার দেশ কোন টেররিস্ট গ্রুপের ব্ল্যাকমেইলের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। কিন্তু,' থেমে দু'হাত চিত করলেন প্রধানমন্ত্রী, 'এই পরিস্থিতিতে আর কী করার আছে আমাদের? নেই কিছু। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই কোনও সরকারের, অন্তত এই ক্ষেত্রে।'

এক-এক করে উপস্থিত সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল তাঁর দৃষ্টি। 'কারও কোন পরামর্শ আছে?'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মারভিন লংফেলো। 'আমার আছে, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার।'

'বলুন!'

'আমার ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিতভাবে জানে এই ঘটনার জন্যে দায়ী কে। সে এ-মুহূর্তে কোথায় আছে, কোত্থেকে কথা বলেছে, আমার বিশ্বাস তাও জানি আমরা। এয়ারক্র্যাফটে আছে সে, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, মেডিটারেনিয়ানের ওপর ফ্রান্সের পারপিগনান থেকে আকাশে উড়েছে ওটা, সঠিক খবর পেতে দেরি হওয়ায় অল্পের জন্যে ওটাকে ধরতে পারিনি আমরা, আই মীন, ফ্রেঞ্চ অথরিটি। ওটায়

বাংলাদেশের একজন এসপিওনাজ এজেন্টও আছে।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রধানমন্ত্রী। 'হ্যাঁ। আপনার কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট আমি পড়েছি এখানে আসার পথে। কি যেন নাম? মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ। আগেও অনেকবার অনেক বড় বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ও আমাদের। এখানে মাসুদ রানার সংস্থার চীফ, রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল রাহাত খান আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের "স্ট্রাইক ফোর্স" প্রধান ছিলেন ইনি,' ঘুরে বৃদ্ধের দিকে তাকালেন লংফেলো। নীরবে পরস্পরের উদ্দেশে নড করলেন প্রধানমন্ত্রী ও রাহাত খান। 'আপনার আপত্তি না থাকলে ভদ্রলোক কিছু বলবেন।'

'অফ কোর্স, অফ কোর্স!' ঝুঁকে বসলেন তিনি। 'বলুন, মিস্টার খান।'

'আমি একটা পরামর্শ দিতে চাইছি, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' নড়েচড়ে বসে বললেন বৃদ্ধ। 'ফ্রেঞ্চ এয়ারফোর্স দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যদি এয়ারক্র্যাফটটাকে অনুসরণ করে, সবচে' ভাল হয়। আমি জানি, এ মুহূর্তে কারও কিছু করার নেই। তবে গ্রুপগুলো কাল যার যার স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর হয়তো ডায়মন্ড উদ্ধারের একটা সুযোগ পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে।'

খানিক ভাবলেন প্রধানমন্ত্রী। মাথা দোলালেন। 'আমার ধারণা ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন আপনি। কারও কোন আপত্তি?' অন্যদের দেখলেন তিনি। সবাই নীরব। বোঝা গেল নেই। 'ওকে, মিস্টার খান। আমি মীটিঙ সেরে কথা বলব ফরাসী প্রেসিডেন্টের সাথে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আপনার মাসুদ রানা,' সামনের ফোল্ডারে চোখ রেখে বললেন তিনি। 'ওই এয়ারক্র্যাফটে আছে শিওর?'

'শিওর,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'অলমোস্ট। ওর কাছে লিসনিঙ ডিভাইস পোরা বিশেষ এক প্যাকেট সিগারেট ছিল। প্যাকেটটা ওখানকার হ্যাঙ্গারে কুড়িয়ে পেয়েছে ফরাসীরা। আমার বিশ্বাস রানা ওটা ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে।'

'আই সী!' আনমনে কান চুলকালেন প্রধানমন্ত্রী। চিন্তিত মনে রাহাত খানের দিকে তাকালেন। 'আপনার কি মনে হয়, মিস্টার খান, মাসুদ রানা কি পারবে পরিস্থিতি সামাল দিতে?'

'ও যদি না পারে, তাহলে পৃথিবীর কেউ পারবে না, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে।

বারো

চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা। মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে বাস্তব পরিস্থিতি। সমস্যা একটা অন্যটাকে ঠেলে লাইনের মাথায় এসে দাঁড়াতে চাইছে, টেনে

নামিয়ে দিতে চাইছে হতাশা সাগরের গভীর তলদেশে।

লক্ষণটা ওর চেনা। পানিতে পড়ে যাওয়া মানুষ যখন কূলের দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাঁচার আশা ছেড়ে দেয় সাঁতার কাটার ক্ষমতা হারিয়ে; অথবা তুষার মোড়া প্রান্তরে পথ হারিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাঁটতে হাঁটতে জমে যায়, ফেটিগে আক্রান্ত হয়, হাল ছেড়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে, তখন হয় এরকম।

এ পর্যন্ত যে সব চমক দেখিয়েছে রজার সাইমুর, তাতে ও পুরো নিশ্চিত, জিতে গেছে লোকটা। কোন সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে রানা। মৃত্যু এখন কেবলই সময়ের ব্যাপার। এখনও যে লোকটা ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে, তা কি দয়া করে? নাকি সে কতবড় ক্ষমতাধর তা প্রমাণ করার জন্যে? তাই হবে, ভাবছে ও, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। নিজের ক্ষমতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে বলে বাঁচিয়ে রেখেছে সে ওদের, বিশেষ করে রানাকে। মৃত্যুর আগে যাতে বুঝে যেতে পারে, কতবড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কি ভুল ও করেছে।

হাল ছেড়ো না, বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছে রানা এতকিছুর পরও, হতাশ হয়ো না। সতর্ক থাকো। কিছু একটা করো এই অপ্রতিরোধ্য দানবটার হাত থেকে নিজেকে, বিশ্বকে রক্ষা করতে।

প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা কম নয় ওর, তাই স্টারলিফটারের বর্তমান ফ্লাইট প্যাটার্ন বুঝে নিতে দেরি হয়নি। বিশাল এক বৃত্ত ধরে একই জায়গায়ই যে ঘুরে চলেছে ওটা, তাতে কোন সন্দেহ নেই রানার। সম্ভবত পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের হবে বৃত্তটা। এবং সর্বোচ্চ উচ্চতায়, অবশ্যই। ফুয়েল খরচ কমাতে এর কোন বিকল্প নেই, সবাই জানে।

মুখ ঘুরিয়ে রোজালিন এদিকেই তাকিয়ে আছে দেখে হাসল। জবাবে ঠোঁট গোল করে চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করল সে। সাহসী মেয়ে, ভাবল রানা। নিয়তিকে মেনে নিয়েছে, ভেতরের মৃত্যু-ভয়ের ছায়া চেহারায় ফুটতে দিচ্ছে না। রজার সাইমুর ওদিকে একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে।

'বুঝলেন, মিস্টার রানা, ডেডলাইন শেষ হওয়ার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে নিচে নামব আমরা ডায়মন্ডের ব্যাগ তোলার জন্যে। যদিও রাডারের মাধ্যমে তার অনেক আগেই জানা হয়ে যাবে কখন ওদের এয়ারক্র্যাফট ওটা ড্রপ্ করে গেছে। ওরা যত আগেই করুক না কেন, আমি নামব শেষ সময়ে, কারণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাটাদের টেনশনে রাখতে চাই আমি। ফ্লোটেশন ব্যাগ সাগর থেকে তুলে নেয়া কোন সমস্যা হবে না। আমার এয়ার ক্রুরা ও-কাজের আর্টও ভালই জানে। বেশ নিচু দিয়ে উড়ব তখন আমরা, পিছনের র‍্যাম্প খুলে লম্বা কেবলের মাথায় বাঁধা গ্র্যাপলিং হুক দিয়ে আমার লোক ওটাকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার মত করে তুলে আনবে। ওটাকে তুলতে উইঞ্চ দরকার হবে অবশ্য, তাও রেডি।' হাসল বিজ্ঞানী। 'কেমন বুঝলেন?'

'ভালই তো!' বলল রানা। 'কিন্তু একটা মুশকিল আছে।'

'কিসের মুশকিল?' ভুরু কুঁচকে গেল সাইমুরের।

'এত ডায়মন্ড বেচতে গেলে বাজারের দফারফা ঘটে যাবে।'

'ও মাই ডিয়ার মাসুদ রানা,' হতাশ হওয়ার ভান করল লোকটা। 'সব সময় আপনি আমাকে এত আন্ডারএস্টিমেন্ট করেন কেন? আমি ধৈর্যশীল মানুষ, আজকের এই বিশেষ দিনটির জন্যে অনেক দিন ধরে রয়ে-সয়ে তৈরি হয়েছি, জানেন? আপনি ভেবেছেন ওগুলো হাতে পেলেই বোঁচকাটা একদল বয় স্কাউটের কাঁধে তুলে দিয়ে বলব: যাও, বাজারে গিয়ে বেচে এসোগে?' মাথা নেড়ে কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধির গভীরতা দেখে সত্যিই বড় হতাশ হলাম, জনাব।

'বলেছি না, এ জন্যে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছি আমি? দরকার দেখলে আবারও করব, এক বছর, বা দু'বছর। কোন অসুবিধে নেই, তাড়াও নেই। তারপর আস্তে আস্তে বাজারে ছাড়ব। ততদিন পর্যন্ত নিজের টাকায় রিঅ্যাক্টর তৈরির কাজ চালিয়ে যাব। টাকা যথেষ্ট আছে আমার, তা দিয়ে কাজ বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু ওরা যদি কঠোর অবস্থান নেয়?' বলল ও। 'যদি দাবি মানতে অস্বীকার করে বসে?'

চাউনি হিমশীতল হয়ে উঠল বিজ্ঞানীর। 'তাহলে এই পৃথিবী আর থাকবে না। অন্তত আকাশে ওড়ার আগে যেটাকে দেখে এসেছেন, সেটাকে আর কোনদিন দেখতে পাবেন না।'

'অর্থাৎ সত্যি সত্যি তাহলে টেররিস্টদের কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দিতে নির্দেশ দেয়া হবে?'

হাত নাড়ল সাইমুর অধৈর্য হয়ে। 'তার কোন প্রয়োজনই হবে না। কাঁপতে কাঁপতে এসে ডায়মন্ড দিয়ে যাবে ওরা।'

'কিন্তু...' থেমে গেল রানা। কি লাভ কথা বাড়িয়ে? তবে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা সহজে রেহাই দিতে চায় না। যদি কোন টেররিস্ট স্কোয়াড কন্ট্রোলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে ভুল করে? অথবা যদি কোন দেশের আহাম্মক, মাথামোটা সিকিউরিটি ফোর্সের নীতি নির্ধারক পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালমত বুঝতে না পেরে কমান্ডো অভিযান চালিয়ে বসে? তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্মাদটার দাবি পূরণ করা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়? কি হবে তখন?

অযথা মাথা গরম করে তোলা হচ্ছে, ভাবল রানা। এসব অকাজের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে বরং কাজের কথা ভাবা যাক। যেভাবে হাত বাঁধা আছে, তাতে নিজেকে মুক্ত করতে পারার সম্ভাবনা প্রায় নেইই বলা চলে। আর পারা গেলেও নিরস্ত্র অবস্থায় এত শত্রুর বিরুদ্ধে কি এমন ঘোড়ার ডিম করতে পারবে ও? হায় খোদা! হারামজাদার প্ল্যানে কোথাও কি বেহুলার বাসর ঘরের মত একটা ছোট্ট ফুটোও নেই?

শূন্য দৃষ্টিতে তার সামনের ইলেক্ট্রনিক জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ঘন ঘন নজর যাচ্ছে অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ মাইক্রোফোন আর ওটার 'স্পীক' লেখা বাটনের দিকে ওটার মাধ্যমেই খুব সম্ভব টেররিস্ট স্কোয়াডগুলোর সাথে কথা বলার ব্যবস্থা আছে সাইমুরের। তাই হবে। দাবি মেনে নেয়া হলে ওটার সাহায্যেই স্কোয়াডগুলোকে নিরস্ত করবে সে। কিন্তু কি বলে? সাঙ্কেতিক কোডটা কি? কিছু

একটা খোঁচাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে, কি যেন মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ পড়ছে না। কি সেটা?

'কাজ শেষে টেররিস্টদের ভাগ্যে কি ঘটবে?' প্রশ্ন করল ও সহজ কণ্ঠে।

ভুরু কুঁচকে চকিত চাউনি দিল বিজ্ঞানী। 'কি ঘটবে মানে?'

'কাজ শেষ হলে আপনি নিশ্চই চলে যাবেন নিজের নিরাপদ ঘাঁটিতে। তখন লোকগুলোর কি হবে?'

'ও,' হেসে উঠল সে। 'যাই ঘটুক, দেখার জন্যে ততক্ষণ বেঁচে থাকছেন না আপনি। কাজেই তা নিয়ে ভেবে লাভ কি?'

রানা মাথা দোলাল। যেন এর চাইতে বড় সত্যি আর হতে পারে না। 'সে আমিও বুঝি। তবু, জানতে ইচ্ছে করছে আর কি!'

'তাহলে শুনুন। ওরা প্যাট্রিকের ডিপার্টমেন্টের,' গলা খাদে নামিয়ে বলল লেয়ার্ড। 'এবং সে আমাদের সাথে নেই এ-মুহূর্তে, আমার বিশ্বাস দুনিয়াতেই নেই। সে যাই হোক, ওরা কাজ করছে সরাসরি প্যাট্রিকের নির্দেশে। এবং জানে, অ্যাকশনের সময় মৃত্যু ঘটতে পারে সবার। জেনেশুনেই নেমেছে কাজে। এখন ওদের নেতা বলতে আছি একমাত্র আমি, গায়েবী নেতা। যদি আমি ওদের বলি, সারেন্ডার করো, সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে প্রত্যেকে। প্যাট্রিক তাই শিখিয়ে গেছে মানুষগুলোকে। মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসবে ওরা, ধরা দেবে পুলিসের হাতে। কারণ ওদের দৃঢ় বিশ্বাস পুলিস কিছু করতে পারবে না, জামিনে ছাড়া পেয়ে যাবে সবাই। অচেনা কেউ একজন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢালবে সে জন্যে।

'কিন্তু?' পাখি-নড়ের সাথে এক চোখ টিপল সে। 'আসলে ঘটবে উল্টো। কাস্টডি, জিজ্ঞাসাবাদ, বিচার ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'ওদের নিরস্ত্র করতে নিশ্চই কোন কোড উচ্চারণ করতে হবে?' বলল ও।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সেইম কোড।'

'ছ'টার জন্যেই?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'সেরকম আয়োজনই আছে। তবে তা উচ্চারণ করার দরকার পড়বে না।'

চট করে বুঝে ফেলল রানা সঙ্কেতটা কি হতে পারে। সহজ যুক্তির ব্যাপার। এবং এই কথাটাই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত খোঁচাচ্ছিল ওকে, মনে পড়ব পড়ব করছিল। ইচ্ছে হলো খানিক উল্লাস প্রকাশ করে নেয়, গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। কিন্তু কোনটাই করল না। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে একদম স্বাভাবিক রাখল নিজেকে। কি করে মুক্তি পাওয়া যায়, তার পিছনে মাথা খাটাতে লাগল ফুল স্পীডে।

একবার যদি হাত দুটো ছাড়ানো যেত, সাইমুরের পিস্তলটা কেড়ে নেয়া কোন সমস্যা হত না। ব্যস্ত হয়ো না, নিজেকে বোঝাল ও, ধীরেসুস্থে উপায় খোঁজো। তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই, প্রচুর সময় আছে হাতে।

ওর এয়ারফোনে ক্লিক আওয়াজ উঠল। পরক্ষণে কথা বলে উঠল ক্যাপ্টেন। 'ক্যাপ্টেন টু দা লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি, স্যার। কাউকে অল্প সময়ের জন্যে এখানে

পাঠিয়ে দিন দয়া করে।'

রানার ঠিক পিছনের চেয়ারে বসা পিটারকে ডাকল সাইমুর। 'ফ্লাইট ডেকে যাও। শুনে এসো।'

দশ মিনিট পর ফিরল দানব। চাউনি দ্বিধাগ্রস্ত। ঝুঁকে দেহের অর্ধেক দৈর্ঘ্য কমিয়ে মনিবের কানে কানে কি যেন বলল। চোখ কুঁচকে শুনল সে, তারপর মৃদু শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে। বসো তুমি।' সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে ওপাশের ডেস্কের দুই এক্সপার্টের দিকে তাকাল লোকটা। 'ক্যাপ্টেন বলছে তার রাডারে খানিক পর পর কিছু একটা ধরা পড়ছে। উত্তরদিকে, ফ্লাইট ডেক রাডার স্কোপের একেবারে শেষ সীমারেখার কাছাকাছি। প্রথমে ওটা কমার্শিয়াল প্লেন হবে ভেবেছিল ক্যাপ্টেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দুটো ব্লিপ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে কাছে চলে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে। টিকটিকি হবে বোধহয়। দেখো তো কি করা যায়।'

'ওপরের স্কোপের রেঞ্জ কত?' জানতে চাইল রানা দুই এক্সপার্টকে কাজে লেগে পড়তে দেখে। বুঝে ফেলেছে ওর সিগারেটের প্যাকেট ফেলে রেখে আসার ব্যাপারটা জেনে গেছেন মারভিন লংফেলো, এবং সেইজন্যেই সম্ভবত ছায়ার মত অনুসরণ করা হচ্ছে স্টারলিফটারকে।

'প্রায় একশো মাইল,' বলল সাইমুর। এ মুহূর্তে মুখে হাসি নেই। ওপাশের ডেস্ক দেখাল হাত ইশারায়। 'ওদেরটা দেড়শো মাইল, প্রায়।'

'ঠিকই আছে, লেয়ার্ড,' স্ক্রীন থেকে চোখ তুলে সোজা হলো এক টেকনিশিয়ান। 'দুটো ডট্। রেঞ্জের মধ্যে এসেই বেরিয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত।'

কোন মন্তব্য করল না লোকটা। সবাই চুপ। পাঁচ মিনিট পর একই লোক কথা বলে উঠল ফের। 'আবার এসেছে! খুব সম্ভব শ্যাডো এয়ারক্র্যাফট। রেঞ্জের বাইরে ঘুরছে, হঠাৎ হঠাৎ কাছে এসে আমাদের অবস্থান দেখে নিচ্ছে হয়তো।'

'দেখুক,' গভীর আত্মগত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'তাতে ওদের কোন উপকার হবে না। কোন অ্যাকশন নিতে পারবে না ব্যাটারা।'

'পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো ঝুঁকিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পারবে না ঠিকই, কিন্তু তারপর?' বলে উঠল মাসুদ রানা।

'কি তারপর?' ঘুরে তাকাল সে।

'তারপর আসবে ওরা। ভয় দেখিয়ে হোক, গুলি করে হোক, স্টারলিফটারকে বাধ্য করবে ল্যান্ড করতে।'

'আবারও আন্ডারএস্টিমেট করছেন আপনি আমাকে, মিস্টার রানা,' আফসোস প্রকাশ পেল তার গলার স্বরে। মাথা দোলাল সে। 'আপনার আবোল-তাবোল কথা শুনে বড় হতাশ আমি। ভেবে পাই না এমন এক জড়বুদ্ধির মানুষকে কি ভেবে আমার পিছনে লাগানো হলো!'

থমকে গেল ও। পেটের মধ্যে আবার গুলিয়ে উঠল। হারামজাদা! মনে মনে বলল, সাক্ষাৎ শয়তান। কোথাও ফাঁক রাখেনি।

'না,' বলল লেয়ার্ড। 'সময় যখন হবে, ওরা তখন স্টারলিফটারকে খুঁজেই পাবে না। ওদের রাডার জ্যাম করে দেব আমি। সে ব্যবস্থা আছে। ওরা কাছে আসার সাহস সঞ্চয় করে ওঠার আগেই বহুদূরে চলে যাব আমি। এবং যতক্ষণ

পর্যন্ত আমি আমার গোপন ঘাঁটিতে সম্পূর্ণ নিরাপদে পৌঁছতে না পারছি, ততক্ষণ রিঅ্যাক্টরগুলোর দখল ছাড়ার নির্দেশ দেব না আমি ওদের।

নিচের ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবল লোকটা। এই প্রথম তাকে এমন কাজ করতে দেখল রানা। 'অবশ্য আমরা যা ভাবছি, ওরা তা নাও হতে পারে। রুটিন, বা দৈব-সংযোগ, অনেক কিছুই হতে পারে।'

তা পারে, নিজের মনে বলল রানা।

স্টারলিফটারের বহু মাইল উত্তরে, ফরাসী ফোর্থ ফাইটার উইঙের দুই সুপার মিরেজ ফাইটার একযোগে বাঁক নিল দুনিয়া কাঁপানো বিকট আওয়াজের সাথে। নিচে আরও দুটো ফাইটার দেখতে পেল প্রথম দুই পাইলট, ধেয়ে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। প্রথম জাড়ার দায়িত্ব নেবে এখন ওরা।

ওপরের লীডার তার ট্রান্সমিটার অন করল। 'ওয়াচডগ ফাইভ।'

জবাব এল এক মুহূর্ত পর। নিচের লীডার বলল, 'ওয়াচডগ ফাইভ, দিস ইজ ওয়াচডগ সিক্স অন রুটিন পেট্রল। উই টেক ওভার নাউ। ইন্সট্রাকশনস্ ইউ রিটার্ন টু বেজ অ্যান্ড রিফুয়েল। ওভার।'

'ওয়াচডগ ফাইভ। ইন্সট্রাকশন্‌স্ আন্ডারস্টুড। অল কোয়ায়েট। হেডিঙস অ্যাজ বিফোর। গুড লাক্।'

মেসেজ অ্যাকনলেজ করল ওয়াচডগ ছয়। পাইলট ও অন্য আরোহীরা দেখল আচমকা কাত হয়ে গেল ওপরের দুই মিরেজ, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ওদের চকচকে ফিউজিলাজ। তারপর পেট ভাসিয়ে দিয়ে দ্রুত এক পাক খেয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। ও দুটোর স্তরে উঠে এল সদ্য আসা দুই মিরেজ, শুরু হলো তাদের চক্কর। এরা কেউই জানে না কেন এই চক্করের আয়োজন করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'এক্সারসাইজ', কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে ওয়াচডগ ছয়ের লীডারের। তার ধারণা এরমধ্যে আরও কোন ব্যাপার আছে।

সেটা যাই হোক, স্কোয়াড্রন কমান্ড্যান্ট ব্যাটা চেপে গেছে। বলেছে, এটা নাকি স্যাপ ডিফেন্স এক্সারসাইজ। তাই যদি হবে, তাহলে কামান থেকে শুরু করে রকেট পর্যন্ত এতসব বোঝাই দেয়ার কি দরকার ছিল?

মুখ নামিয়ে নিজের খুদে রাডার স্ক্রীনে চোখ বোলাল সে, ব্লিপ ঠিক জায়গায়ই আছে দেখে সন্তুষ্ট হলো। ঘুরে গেল দুই মিরেজ, নতুন করে আরেক দীর্ঘ চক্কর শুরু করল।

দক্ষিণে, পারপিগনান এয়ারপোর্টের মূল রানওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া সেপক্যাট জাগুয়ার। খুব অল্প সময়ের নোটিশে আকাশে ওড়ার জন্যে তৈরি। ওদিকে এয়ারপোর্টের অপারেশন রুমে কয়েকজন সিনিয়র-জুনিয়র আর্মি ডি ল'এয়ার অফিসার নির্ধারিত ফরমে অ্যালডান অ্যারোস্পেস কর্তৃপক্ষের লিখে রেখে যাওয়া তাদের স্টারলিফটারের ফ্লাইট প্ল্যান পরখ করে দেখছে।

ঠিকই আছে। আর সব বিষয়ের মত ওখানেও কোন ফাঁক রাখেনি সাইমুর। ফরমে লেখা আছে, অ্যালডানের নিজস্ব কিছু সিভিল এভিয়েশন ইকুইপমেন্টের কার্যকারিতা পরখ করে দেখার জন্যে কম করেও একুশ ঘণ্টা একনাগাড়ে উড়বে

তারা মেডিটারেনিয়ানের ওপর, ত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। তারপর প্রায় সী লেভেলে নেমে আসবে স্টারলিফটার, এবং সবশেষে, কাল দুপুর একটার দিকে পারপিগনান এয়ারপোর্টে ফিরে আসবে।

'ঠিকই তো আছে দেখছি,' বলল চিন্তিত, কিছুটা বিভ্রান্ত এক জুনিয়র অফিসার। 'এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই মনে হচ্ছে।'

'আছে হে!' মাথা দোলাল দলের সিনিয়রমোস্ট অফিসার। 'এত বড় ফাঁক আছে যার মধ্যে দিয়ে আস্ত তোমাকে সেঁধিয়ে দেয়া যাবে।'

ওদিকে লন্ডনে নিজের অফিসে বন্ধু রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছেন মারভিন লংফেলো। ফ্রান্স থেকে রেডিওর মাধ্যমে আসা কয়েকটা রিপোর্টে চোখ বোলাচ্ছেন দু'জনে পালা করে। রজার সাইমুরের স্টারলিফটার ফিল্ড ফ্লাইট প্ল্যান অনুসরণ করছে, শেষ বার্তায় আছে তথ্যটা।

দু'জনেই পড়লেন ওটা, তারপর নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। চিন্তিত, গম্ভীর চেহারা ওঁদের।

'লোকটা মানুষ নয়, খান,' ক্ষোভের সাথে বলে উঠলেন লংফেলো। 'একটা আস্ত শয়তান, হাড় হারামজাদা। মানুষ কখনও এত নির্ভুল হতে পারে?'

জবাব দিলেন না তিনি, শুনতে পাননি হয়তো। আনমনে এইমাত্র আসা আরেকটা মেসেজ নাড়াচাড়া করছেন। ওটা স্প্যানিশ উপকূলের কাছের এক ফ্রেঞ্চ শহর থেকে এসেছে প্যারিস হয়ে। বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট শহরের কাছের পাহাড়ী এলাকায় আজই সকাল দশটা নাগাদ এক কপ্টার দুর্ঘটনা ঘটেছে। পাইলটসহ চারজন যাত্রীর সবাই নিহত হয়েছে দুর্ঘটনায়। এদের একজন মেয়ে। অ্যালডান অ্যারোস্পেসের কপ্টার ছিল ওটা।

আরোহীদের পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি। সে চেষ্টা চলছে।

কয়েক যুগ পর অবশেষে আঁধার নেমেছে ভূমধ্যসাগরে। সামনে অনেক লম্বা রাত। অসহ্য লাগছে মাসুদ রানার। জীবন-মৃত্যুর মাঝের অনিশ্চিত এই প্রতীক্ষার যদি একটা সুরাহা হয়ে যেত, এখনই, বড় ভাল হত। চুকে যেত ঝামেলা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এত সহজে তা হবে না।

দম দেয়া পুতুলের মত মুখ বুজে কাজ করে চলেছে সাইমুরের স্টাফ-ক্রুরা। কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই, রুটিন অনুযায়ী চলছে সবকিছু। বাঁধা নিয়ম, কোথাও তিল পরিমাণ বিচ্যুতি নেই। সময়মত খাবার, পানীয়, কফি এমনকি সিগারেট পর্যন্ত না চাইতেই হাজির পাচ্ছে রানা ও রোজালিন। এবং সবকিছু সেরা জিনিস। অন্য সবাই সময়মত ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়ে আসছে। তবে একা থাকার সুযোগ একদম দেয়া হচ্ছে না ওদের—সাইমুর গেলে পিটার পাহারায় থাকে, অথবা পরেরজন গেলে আগেরজন।

মাঝেমধ্যে এটা-ওটা নিয়ে এক আধটা মন্তব্য বিনিময় হচ্ছে রানা ও বিজ্ঞানীর মধ্যে। অবশ্য কথা বলার আগ্রহে এরইমধ্যে বেশ ভাটা পড়েছে লোকটার, আগের মত সুযোগ পেলেই বক্ বক্ করে না। বলে, তবে দু'চার কথায় বক্তব্য শেষ করে চুপ মেরে যায়। খাওয়ার সময় হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়

ওদের, বাথরুমে যাওয়ার সময়ও। পরেরটার বেলায় একজন সশস্ত্র গার্ড থাকে সঙ্গে। ক্লজিটের দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে অপেক্ষা করে। কাজ শেষ হলে ফিরিয়ে এনে আবার কষে বাঁধে।

কঠিন ব্যবস্থা, কোথাও কোন খুঁত নেই। তবু হাল ছাড়েনি রানা। আশা ছাড়েনি। লেগে আছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, লেগে থাকলে একটা না একটা সুযোগ আসবেই। মুক্তির কোন না কোন পথ পাওয়া যাবেই। অবশেষে ওর ধৈর্য আর আত্মবিশ্বাসের জয় হয়েছে, নিজেকে মুক্ত করার একটা পথ পেয়ে গেছে রানা। কাজও শুরু করে দিয়েছে সেই লাইনে।

শেষবার বাথরুমে গিয়ে টিসু পেপার দিয়ে টিপে টিপে মোটামুটি তিন ইঞ্চি লম্বা, মজবুত এক রোল তৈরি করেছে ও। ফিরে চেয়ারে বসার সময় জিনিসটা ছিল ডান হাতের মুঠোয়, হাত বাঁধার আগে কৌশলে ওটাকে দুই কব্জির মাঝখানে লম্বালম্বি আটকে রেখেছিল, চোখে পড়েনি গার্ড লোকটার। রোলসহ বেঁধে ফেলেছে হাত। এস্কেপোলজির পুরানো একটা ট্রিক্ এটা, তবে যথেষ্ট কার্যকর।

এ মুহূর্তে ট্রিকের বাকিটুকু সারার কাজে লেগে আছে রানা, মজবুত বাঁধনের ফাঁক গলিয়ে ওটা আবার মুঠোয় নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজটা কঠিন, দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অবশেষে প্রায় ঘণ্টাখানেক কব্জি ঘষাঘষির পর যখন বেরিয়ে এল ওটা, বাঁধন দু'ইঞ্চিমত ঢিলে হলো। এবার হাত ঘুরিয়ে ওয়েবিঙ বেল্টের গিঁঠ ধরতে পারল রানা। আনন্দে অস্থির হয়ে পড়লেও তখনই বাকি কাজে হাত দিল না, ধৈর্য ধরে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকল।

এখন নয়, নিজেকে বোঝাল। না ঘুমাক, ক্লান্ত হয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঝিমিয়ে পড়বে সবাই ভোরের দিকে, তখন। হ্যাঁ, তাই। সবাই সে সময় ক্লান্ত থাকবে, দেহ-মনের শক্তিতে ভাটা চলবে, সেই সময়। যদি এর মাঝে সুযোগটা কোনমতে বরবাদ না হয়।

ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উঠে গিয়ে ক্যান্টিন থেকে কফি খেয়ে এল বিজ্ঞানী। রানা তখন চোখ বুজে ঝিম মেরে পড়ে আছে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে আসলে। লোকটা ফিরে আসতে পিটার আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল, কফি খেতে যাওয়ার অনুমতি চাইল মনিবের কাছে।

মাথা ঝাঁকাল সে কনসোল থেকে চোখ না তুলে। বেরিয়ে গেল দানব। চোখের পাতা ইঞ্চির দশভাগের একভাগ মেলল ও, বিজ্ঞানীকে দেখল। নিজের কাজে আছে ব্যাটা, অন্য কোনদিকে বিশেষ খেয়াল নেই। সিদ্ধান্ত নিল ও, কাজ সারতে হবে খুবই দ্রুত, এবং আঘাতের লক্ষ্য হতে হবে নির্ভুল। চট্ করে মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলে ওপাশের ডেস্কের দুই টেকনিশিয়ানকে দেখে নিল রানা। একজন চোখ বুজে বসে আছে, তবে ঘুমায়নি, বোঝা যায়। অন্যজনের চোখ রাডার স্ক্যানারের ওপর। রোজালিন ঘুমাচ্ছে কি না বোঝা গেল না। চোখ বন্ধ। এদিকে সাইমুরের মনও সম্পূর্ণ ব্যস্ত সামনের ইকুইপমেন্টসের জঙ্গলে।

এইবার!

দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড় করে কয়েক ঝাঁকি দিতেই বাঁধন নেমে গেল

নিচে, আঙুলের সহজ নাগালে। বাকি কাজ অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে সারল ও, বেল্ট আস্তে করে পায়ের কাছে ফেলে দিল, সাইমুরের উল্টোদিকে। হাত মুঠো পাকাল কয়েকবার, খুলল, শেষবারের মত আরেকবার ভেবে ঠিক করে নিল প্ল্যান অভ অ্যাকশন।

তারপর নিঃশব্দে চেয়ারসহ ঘুরে গেল বিজ্ঞানীর দিকে। ডান হাত বিদ্যুদ্বেগে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠে গেল পিছন দিকে, কিনারা দিয়ে সর্বশক্তিতে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মেরে বসল রানা সাইমুরের ঘাড়ে। চরম আঘাতই হেনেছিল, কিন্তু লক্ষ্য থেকে সামান্য নিচে লাগায় প্রাণে বেঁচে গেল লোকটা। মুখ দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় একটা আওয়াজ করে কনসোলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নাক-মুখ দিয়ে, প্রচণ্ড সংঘর্ষে থর থর করে কেঁপে উঠল যন্ত্রপাতি।

দেরি করেনি ও, প্রায় একই সঙ্গে বাঁ হাতও চালিয়ে দিয়েছে, একটানে লোকটার হোলস্টার থেকে বের করে এনেছে কোল্ট পাইথন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না, কিসের সাথে কিসের সংঘর্ষ হলো দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়েই ঠিক মাঝ কপালে গুলি খেলো এপাশের টেকনিশিয়ান। মারা গেল চোখের পলকে। গুলির শব্দে আঁতকে উঠল রোজালিন, টকটকে লাল দুই বিস্ফারিত চোখে ঘুরে তাকাল। পরক্ষণে হাঁ হয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে।

'মাথা নিচু করো!' চেঁচিয়ে বলল রানা। দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়ল প্রায় একই মুহূর্তে। দুটো গুলির মাঝে সময়ের ব্যবধান অল্পই ছিল, তবু এরইমধ্যে নিজের অস্ত্র বের করে ফেলেছিল দ্বিতীয় টেকনিশিয়ান। কানের পাশে গুলি খেয়ে ভীষণ জোরে ঝাঁকি খেলো তার মাথা, চেয়ারসহ আরেকদিকে ঘুরে গেল দেহটা, নিথর হয়ে গেছে। আলগা মুঠো থেকে ঠক করে মেঝেতে পড়ল তার পিস্তল। প্রথমজন হাঁ করে চিত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, কপালে ছোট্ট একটা লাল ফুটো। এদিকে উন্মাদ বিজ্ঞানী নিথর-মাথা ডেস্কের কিনারায়, দু'হাত মরা সাপের মত ঝুলছে দু'পাশে। কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। উল্টে গেছে পাশার ছক্।

অদ্ভুত নীরবতা চেপে বসেছে কেবিনে। রোজালিনের চমক কাটেনি এখনও, হাঁ করে আছে, চাউনিতে রাজ্যের অবিশ্বাস। এমনভাবে রানাকে দেখছে যেন ও ভিন্ গ্রহবাসী, অদ্ভুত একটা কিছু।

'ইট'স ওকে, রোজ,' বলল রানা। 'আর ভয় নেই। শান্ত হও।'

চোখে পলক পড়ল এবার মেয়েটির, অবিশ্বাসের জায়গা দখল করল আতঙ্ক। মুখ ঘুরিয়ে দুই মৃতদেহ দেখল খানিকক্ষণ, তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'সরি, রানা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি করে--?'

'এখন না। পরে বলছি,' বুকের মজবুত বাঁধনটা খোলার চেষ্টা করল ও কিছুক্ষণ। কিন্তু কাজ হলো না। চেয়ারের পিছনে এমন জায়গায় গিঁঠ দিয়ে বাঁধা হয়েছে, হাত পৌঁছাচ্ছে না সেখানে। কাজেই সে চেষ্টা আপাতত বাদ দিয়ে আসল কাজে মন দিল। রিভলভার বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে অ্যাডজাস্টেবল্ মাইক্রোফোনের মাথা মুখের যথাসম্ভব কাছে টেনে আনল। ওর ধারণা কতদূর সত্যি এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, ভাবতে ভাবতে 'স্পীক্' লেখা বোতাম টিপে দিয়ে সামনে ঝুঁকল। ভেতরের অস্থিরতা চেপে রেখে শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল:

'নাম্বার ওয়ান···লক্।'
'নাম্বার টু···লক্।'
'নাম্বার থ্রী···লক্।'
'নাম্বার ফোর···লক্।'
'নাম্বার ফাইভ···লক্।'
'নাম্বার সিক্স···লক্।'

সুইচ অফ করে ফোঁস করে দম ছাড়ল ও। কাজ কি হয়েছে? হবে? হবে-খুব সম্ভব। ওয়ারলক নাম নিয়েছিল রজার সাইমুর তার অপারেশন মেল্টডাউনের জন্যে। শুরু যদি 'ওয়ার' দিয়ে হয়, শেষ 'লক্' দিয়েই হওয়ার কথা। সহজ যুক্তি তাই বলে।

মুখ তুলে রোজালিনকে দেখল। 'প্রার্থনা করো যেন কাজ হয়।' ডান হীল ঘুরিয়ে ওপরে নিয়ে এল ও। গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে ছুরিটা বের করে বেল্ট কাটতে লেগে পড়ল।

'তাড়াতাড়ি করো, রানা,' ভয়ে ভয়ে একবার পাইডিঙ ডোরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মেয়েটি। 'পিটার এসে পড়তে পারে।'

'চেষ্টা করছি।' ছুরি নিয়ে ওয়েবিঙ স্ট্র্যাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। জিনিসটা বেশ পুরু আর চওড়া, তারওপর এত শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, চামড়ার ভেতরে গেঁথে আছে। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে তীক্ষ্ণধার ব্লেডের খোঁচায় নিজেকে আহতই করা হবে কেবল, তাই সাবধানে কাজ করছে। দেরি হচ্ছে দেখে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি, ঢোক গিলছে।

'এত দেরি হচ্ছে কেন?' বলল সে ব্যস্ত, চাপা গলায়।

'এই তো, হয়ে গেছে। *নিক্স প্যানিকাস,* ভয় পেয়ো না।' কাজের ফাঁকে অজ্ঞান লেয়ার্ডের দিকে তাকাল রানা। পাইডিঙ দরজা দেখল কয়েকবার, রোজালিনকে আড়াল করে। নিজেও যে পিটারের যে-কোন মুহূর্তে হাজির হওয়ার আতঙ্কে আছে তা ওকে বুঝতে দিতে চায় না। একটু একটু করে বেল্ট কেটে চলেছে ও, একইসাথে ঘামছে ভেতরে ভেতরে। অবশেষে কাজটা শেষ হলো একসময়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। এখন কেবল সীট বেল্ট খোলা বাকি।

এক ঝটকায় ওটা খুলে সেকেন্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়াল রানা, তিন লম্বা পায়ে পৌঁছে গেল রোজালিনের পাশে। হাঁটু গেড়ে বসে ওর বাঁধন খুলতে লেগে গেল।

'ওটা ওখানে ফেলে এলে কেন?' সাইমুরের ডেস্কে রেখে আসা কোল্ট পাইথন দেখাল সে। 'নিয়ে এসো।'

চিন্তা কোরো না,' রানা বলল। 'এই তো, হয়ে গেছে। ও ব্যাটা আসতে আসতে···' মুখ তুলে থেমে পড়ল মেয়েটির চোখ বড় হয়ে উঠেছে দেখে। পাইডিঙ ডোরের দিকে তাকিয়ে আছে।

পাঁই করে ঘুরল ও। ভেতরে ঢুকছে স্কটিশ দানব, এক হাতে এখনও ধরে আছে দরজা। রানার শূন্য চেয়ার দেখেই চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার, পরমুহূর্তে দেখল রক্তাক্ত লেয়ার্ডকে। দেরি না করে পাইথন লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা, যদিও বুঝল পিটারের আগে ওটার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

এক মুহূর্ত লাগল লোকটার চমক কাটতে, উন্মত্ত রাগে দানবীয় এক হুঙ্কার ছেড়ে সে-ও ডাইভ দিল।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল রোজালিন, চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে।

তেরো

লন্ডন। ভোর পাঁচটা। স্থানীয় রানা এজেন্সির অপারেশনস্ রুমে ঝিম্ মেরে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ঢাকা থেকে ছুটে আসার পর প্রায় দু'দিন পেরিয়ে গেছে, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার চাপে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে চোখ বোজার সময় পাননি এরমধ্যে। মাসুদ রানার খবর না পাওয়া পর্যন্ত ও কাজ তাঁকে দিয়ে হবে না, জানেন। তাই সে চেষ্টা করছেনও না বৃদ্ধ।

বসে আছেন লাল টেলিফোনের কাছে, কখন কোন্ খবর আসে তা তৎক্ষণাৎ জানার জন্যে। বিএসএসের মত রানা এজেন্সি এবং বিসিআইয়েরও সমস্ত সোর্স এ মুহূর্তে ভীষণ তৎপর স্টারলিফটারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কাজে। প্রথমে মারভিন লংফেলোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রানা ওটাতেই আছে, কিন্তু পরে যখন অ্যালডান অ্যারোস্পেসের এক কপ্টার দুর্ঘটনায় চার যাত্রীর মারা যাওয়ার খবর এল, ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল দু'জনেরই। আশঙ্কা জেগেছিল ওর মধ্যে রানাও হয়তো আছে ভেবে। কিন্তু পরে যখন মৃতদের পরিচয় জানল ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস, শুধু হাঁপই ছাড়েননি ওঁরা, নতুন আশায় বুকও বেঁধেছেন।

জানা গেছে পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিল কুখ্যাত সন্ত্রাসী প্যাট্রিক অলিভিয়েরো আরগুয়েলো। মেয়েটি আর কেউ নয়, রজার সাইমুরের বান্ধবী, মে হরোইৎজ। অন্য দু'জনের একজন পাইলট, অন্যজন সাইমুরের পোষা কুকুর। দুর্ঘটনা সম্পর্কে ফরাসী পুলিসের ধারণা, আকাশে ওঠার পর ওটার মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় পাইলটের মৃত্যুই এর কারণ। মাথার পিছনে গুলি লেগে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে লোকটার। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাননি রাহাত খান বা লংফেলো, ওর মধ্যে রানা ছিল না জেনেই খুশি।

তারপর থেকে চলছে অপেক্ষার পালা। ঠিক পাঁচটা দশে এল ফোন। করেছেন বিএসএস চীফ। 'ইয়েস?' দ্বিতীয় রিঙ বাজার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার তুললেন রাহাত খান।

'সুখবর আছে, খান। ওরা সারেন্ডার করেছে,' উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন তিনি। 'সবগুলো গ্রুপ।'

'কারা?' গলা চড়ে গেল বৃদ্ধের।

'টেররিস্টরা। এখানে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, সবখানে সারেন্ডার করেছে ওরা হঠাৎ। রিঅ্যাক্টর ছেড়ে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসেছে সবাই একসাথে। বলছে, ওদের কাজ নাকি হয়ে গেছে।'

'সেকি!' চোখ কুঁচকে উঠল তাঁর।

'হ্যাঁ। একটু আগেই ঘটেছে ব্যাপারটা, প্রায় একই সঙ্গে। রিপোর্ট এখনও আসছে। ওরা বলছে, ওদেরকে নাকি কন্ট্রোল রুমের দখল ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। হেইশাম ওয়ান ছেড়ে আসা এক সন্ত্রাসীর ধারণা, তাদের অপারেশন সফল হয়েছে বলেই বেরিয়ে আসতে বলা হয়েছে তাদের। এক ইন্টারোগেটর অবশ্য অন্য কথা বলছে।'

'কি?' ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করলেন না রাহাত খান। 'কি বলছে সে?'

'সে বলছে, সারেন্ডারের অর্ডার ভুল করে দেয়া হয়েছে তাদের।'

'এমন এক ইঞ্জিনিয়াস, ব্রিলিয়ান্টলি অর্গানাইজড স্ট্রাটেজিতে ভুল!' চরম বিস্ময় ফুটল তাঁর কণ্ঠে। 'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমি তোমার সাথে একমত, এ নিশ্চই...'

'হ্যাঁ। ওরই কাজ।' নিঃশব্দ, চওড়া হাসিতে ভরে উঠল রাহাত খানের ক্লান্ত চেহারা। খানিক চুপ থেকে কার উদ্দেশে যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। 'স্টারলিফটারের কি খবর?'

'একই। ঘুরছে। ফ্রেঞ্চ এয়ারফোর্স ওটার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। রিঅ্যাক্টরগুলো ঠিক ঠাক আছে নিশ্চিত হওয়া গেলেই...'

'কি?' বাধা দিয়ে বললেন তিনি। 'কি করতে যাচ্ছে ওরা? জোর করে ল্যান্ড করাতে যাচ্ছে ওদের?' রিসিভারে মুঠো শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে।

'প্রথমেই তা করবে না ওরা,' বললেন বিএসএস চীফ। গলা একটু দ্বিধাগ্রস্ত। 'তবে বাধ্য করা হলে হয়তো করতেও পারে।'

থমকে গেলেন বৃদ্ধ। 'ডিসিশনটা কাদের?'

'ফ্রেঞ্চদেরই। ওরা নিজে থেকেই করতে চাইছে কাজটা।'

'আই সী!' বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি।

'দুশ্চিন্তা কোরো না, খান। আমি খবর পেয়েই কথা বলেছি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে। ওরা যাতে এ কাজ এখনই না করে, সে জন্যে তিনি ওদের অনুরোধ করবেন। হয়তো এতক্ষণে করেও ফেলেছেন অলরেডি। কাজেই ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

বলার মত কিছু পেলেন না রাহাত খান, আলতো করে রিসিভার রেখে দিলেন।

বিপদটা দেখেই রানা বুঝে ফেলেছিল হবে না, হলোও না। অর্ধেক পথও পার হতে পারল না, আহত, ক্ষিপ্ত হাতীর মত কোনাকুনি ছুটে এল রজার সাইমুরের চীফ লেফটেন্যান্ট, গন্ডি আর বিশাল বপুর মিলিত কয়েক টন ওজন নিয়ে বুলডোজারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। লোকটার ভয়াবহ চিৎকারে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। ঝড়ে উপড়ানো গাছচাপা পড়লে মানুষের কেমন অনুভূতি হয় জানা নেই, তবে এর সাথে যে তার বিশেষ তফাত নেই, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

অস্ত্রটা সঙ্গে না রাখার আহাম্মকির জন্যে নিজেকে অভিসম্পাত করতে করতে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, পরক্ষণে চোখে আঁধার দেখল পাঁজরের কাছে ক্রুদ্ধ দানবের হাঁটুর গুতো খেয়ে। ভোঁশ করে বুকের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। আঘাত এত জোরে লেগেছে যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবির হয়ে থাকল ও বোধ হারিয়ে। পলকে বুকের ওপর চেপে বসল পিটার, মনিবের জন্যে বেদনা আর রাগের মিলিত তাড়নায় গর্জন করছে, গোঙাচ্ছে। অনবরত কি সব বকে চলেছে ক্ষিপ্ত গলায়। বোধজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে লোকটা পুরোপুরি।

রোজালিনের সাহায্যের আশায় চিৎকার করে উঠল ও, কিন্তু আওয়াজটা বের হওয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই ঘ্যাঁক করে পুরো গলা চেপে ধরল দানব ডান হাতের প্রকাণ্ড থাবায়। দু'পাশে হাঁটু রেখে চেপে বসল ওর পেটের ওপর। গলায় চাপ খেয়ে অন্তরাত্মা উড়ে গেল রানার। কিন্তু ওটা যে আসলে চাপ ছিল না, ছিল মহড়া, বুঝল একমুহূর্ত পর। চাপের চোটে লালচে কুয়াশার হালকা একটা পর্দা দুলে উঠল ওর চোখের সামনে, জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা।

আরেকবার চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল রানা, দুর্বোধ্য একটা গোঙানি বের হলো কেবল, তাও অস্ফুটে। ততক্ষণে শক্তি প্রায় ফুরিয়ে গেছে, চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারছে না ও। আশা নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, ধোঁয়াটে দৃষ্টি পিটারের বিকট মুখের ওপর স্থির- জানালা দিয়ে আসা কচি রোদের আলো পড়ে ঘর্মাক্ত চেহারা চক্ চক্ করছে তার।

হঠাৎ করে পাল্টে গেল দৃশ্যটা, আউট অভ ফোকাস হয়ে গেল দানব, গলার ওপর থেকে সরে গেছে সাঁড়াশী। কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করল রানার ধোঁয়ার বৃত্তে বন্দী মন। স্টারলিফটার কি লাফ দিল? হ্যাঁ, তাই তো! এঞ্জিনের একটানা গুঞ্জনও অন্যরকম শোনাচ্ছে এখন। পিটার হারামজাদা গেল কোথায়? ও কি দোলনায়? কুয়াশা কেটে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা। একই সময় প্লেনের সামনের দিকে ছেঁচড়ে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল ও।

রোজালিনের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে সচকিত হলো, ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল, তখনই আবার দুলে উঠল আকাশ-দানব। ঠিক দুলে নয়, অনেকটা যেন হোঁচট খেলো। বেশ জোর ছিল হোঁচটে। প্রথম হোঁচটই ওকে বাঁচিয়েছে– স্টারলিফটার বিনা নোটিশে ডাইভ দেয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে পিছনদিকে উল্টে পড়ে যাচ্ছে দেখে রানাকে ছেড়ে ওপাশের ডেস্ক আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল দানব।

দ্বিতীয় হোঁচটের ধাক্কা সামলে স্টারলিফটার সোজা হতেই আবার ছুটে এল, যদিও চেহারায় আগের সেই আত্মবিশ্বাসের অনেকটাই গায়েব এ মুহূর্তে। চোখ রানার ওপর থাকলেও মনটা যে বাইরে, তা বোঝা যায়। অনেক কষ্টে ঢোক গিলল রানা, হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে সাইমুরের কনসোলের ওপর রাখা অস্ত্রটা খুঁজল হন্যে হয়ে। নেই। বিজ্ঞানী পড়ে আছে ফ্লোরে, ডেস্ক আর চেয়ারের মাঝখানে আটকে গেছে।

এসে পড়েছে স্কটিশ দানব। পাইথনের আশা ছেড়ে নিজের ছোট ছুরিটা

খুঁজল রানা, সেটাও নেই। অতএব খালি হাতেই বোঝাপড়া করার জন্যে তৈরি হলো। এসে পড়েছে। চোখের কোণ দিয়ে রোজালিনকে দেখল ও, চেয়ার আঁকড়ে ধরে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরে কি যেন দেখছে।

আবার ডাইভ দিল স্টারলিফটার—বড় ঢেউয়ের ফাঁকের মধ্যে পড়লে ছোট বোট যেভাবে নাক নিচু করে ঝাঁপ দেয়, অনেকটা তেমনি করে। সুযোগটা লুফে নিল রানা। পিটার ক্র্যাফটের সামনের দিক থেকে আসছে, ও রয়েছে ডেস্কের কাছে, ফলে প্লেন ডাইভ দিতেই সামনের দিকে ছুটে যাওয়ার যে ঝোঁক দেখা দিল, তার সাথে নিজের গতি যোগ করে লাফ দিল রানা দুই পা এক করে।

লোকটার বুকের ওপর পড়ল ওর জোড়াপায়ের লাথি। তবে রানার ইচ্ছেমত জোর হলো না ওটায়, কারণ ওর ঝোঁক যেমন ছিল সামনের দিকে, তেমনি পিটারের ছিল পিছন দিকে। তবু যেটুকু লাগল, তাতেই বুকের বাতাস বেরিয়ে গেল তার, হুঁক! করে আছড়ে পড়েই এক ডিগবাজি দিয়ে দড়াম করে পড়ল গিয়ে পার্টিশনের ওপর। থর থর কেঁপে উঠল ওটা।

ফ্লোরে পড়েই উঠে দাঁড়াল রানা, চেহারা বিকৃত করে ঢোক গিলে তৈরি হলো আবার। ওদিক থেকে চিৎকার করে উঠল রোজালিন, 'রানা! ফাইটার! ওরা···ওরা রকেট ছুঁড়ছে!'

তাকাবার সুযোগ হলো না ওর, উঠে পড়েছে ওদিকে পিটার। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রাগে। অবশ্য গতি অনেক কম, কারণ এখনও নাক সোজা হয়নি স্টারলিফটারের, সাঁই-সাঁই করে নিচের দিকে নেমে চলেছে। ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত. আর্তনাদ করছে ফিউজিলাজ। হঠাৎ চোখ পড়ল ওর সাইমুরের পাইথনের ওপর, পিটার আর ওর মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে ফ্লোরে। প্রায় একইমুহূর্তে দানবও দেখল জিনিসটা।

বিকট আওয়াজ উঠল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে জোর এক ঝাঁকি খেয়েই ডানদিকে কাত হয়ে গেল প্লেন। পিটার লাফ দিল অস্ত্রটা লক্ষ্য করে। ঝাঁকি খাওয়ার আগমুহূর্তে লাফটা দিয়েছে সে, ফলে বিশেষ একটা অসুবিধে হলো না। জায়গামতই পড়ল, থাবা দিয়ে রিভলভার ধরে ফেলল, সবে গড়াতে শুরু করেছিল তখন ওটা। রানা অল্পের জন্যে মিস করল। লাফ দিতে সামান্য দেরি হওয়ায় প্লেনের ঝাঁকি লক্ষ্য থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে ফেলেছে ওকে। কোল্ট মুঠোয় পুরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল দানব, প্রকাণ্ড মুখে উল্লাস। রাগের জায়গা দখল করেছে বিকট হাসি।

'কাজটা আমি অন্যভাবে সারব, মাসুদ রানা,' ওর চোখে ভীতি ফুটতে দেখে চেঁচিয়ে বলল পিটার। মুঠোর মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোল্ট দোলাল। 'গুলি করলে ফট্ করে মরে যাবে, কিন্তু আমি তা চাই না। ওদিকে,' অস্ত্র দুলিয়ে লাল রঙে আঁকা পিছনের বন্ধ হ্যাচওয়ে দেখাল। 'ওদিকে চলো।'

কয়েক পা এগোল লোকটা ভারসাম্য বজায় রাখার কসরৎ করতে করতে। এখনও সোজা হয়নি স্টারলিফটার, কাত হয়ে নেমেই চলেছে তুমুল গতিতে। এঞ্জিনের আর্তনাদে কান পাতা দায়। 'হাঁটো!' হুঙ্কার ছাড়ল সে আবার।

উপায় নেই, ভাবল ও। নির্দেশ না মানলে গুলি অবশ্যই করবে লোকটা,

কোন ভুল নেই। তারচেয়ে বরং মেনে দেখা যাক কি করাতে চায় সে ওকে দিয়ে। সময় পেলে আরেকটা সুযোগ পাওয়া যেতেও পারে। ঢালু পথ দিয়ে কাঁকড়ার মত এগোল রানা ধরে ধরে। যেন পাহাড়ে চড়ছে। টেনেহিঁচড়ে কোনরকমে পৌঁছল এসে জায়গামত। পিটারও এল পিছন পিছন।

তবে খুব কাছে এল না। রানাকে আর কোন সুযোগ দিতে চায় না। 'এইবার,' বলে উঠল সে। 'দরজাটা খোলো। ধরে রাখো আমি এসে না ধরা পর্যন্ত।'

তাই করল ও। এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ধরে থাকল পাইডিঙ হ্যাচওয়ে। একটু পর পিঠে পাইথনের খোঁচা খেয়ে বুঝল এসে গেছে লোকটা। এক হাতে দরজা ধরে জোর এক ধাক্কায় রানাকে ভেতরে পাঠিয়ে নিজেও ঢুকল। দরজা ছাড়েনি এখনও। সামনে তাকাল রানা। বেশ বড় এক স্পেস, স্টারলিফটারের মাল রাখার জায়গা। ওপরে মালপত্র র‍্যাম্প পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার লম্বা লম্বা রেইল। দরজা ছেড়ে রানার কলার ধরতে হাত বাড়িয়েছিল পিটার, এমনসময় খুব দ্রুত বাঁক নিল প্লেন, অল্পের জন্যে তার হাত থেকে ছুটে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল ও। পড়ে যাচ্ছিল, সময়মত থাবা দিয়ে এক রেইল ধরে সামলে নিল।

'আমি এখনও তোমার দিকে জিনিসটা ধরে আছি, রানা,' নিজেকে স্থির করে বলল পিটার। 'চালাকি করতে যেয়ো না কোন।'

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। জায়গাটা ঠাণ্ডা, ফুয়েলের গন্ধ ভাসছে। তার সাথে আছে প্লাস্টিকের গন্ধ, সব এয়ারক্র্যাফটে পাওয়া যায় এই অদ্ভুত গন্ধটা। রেইল ছাড়ার সুযোগ পেল না ও, স্টারলিফটার ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে, নামছে এখনও। থেকে থেকে ঝাঁকি খাচ্ছে ভীষণভাবে। ঝাঁকির কারণ এখন বুঝতে পারছে ও। ভয় দেখিয়ে এটাকে অবতরণ করানোর চেষ্টা চলছে, খুব সম্ভব ফরাসী ফাইটার লেগেছে পিছনে। সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেদ করে ওগুলো বারবার কাছে চলে আসছে বলে বাতাসের অস্বাভাবিক কম্পনের ফলে ঝাঁকি খাচ্ছে স্টারলিফটার।

পিছনে বড় কোন সুইচ অন করার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে হাইড্রলিক মেশিনের গুঞ্জন উঠল, সার্বক্ষণিক কাঁপুনি শুরু হলো ফ্লোরের। ঘুরে তাকাল রানা। দেখল হ্যাচওয়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দানব হেলান দিয়ে, ডান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে ধরে আছে দেয়ালের এক ধাতব বক্স থেকে বেরিয়ে আসা দুই ফুট লম্বা নাইফ-সুইচ। সুইচটা 'অন' করেছে সে। আরেক ডাইভের ধাক্কা সামলে হাসল।

'লেয়ার্ডের ইচ্ছে ছিল কেব্‌লের সাথে তোমাকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেবে নিচে, র‍্যানসমের ব্যাগ তোমাকে দিয়ে তোলাবে,' বলল লোকটা। 'পরে বাদ দেয় সে প্ল্যান। আমি তাই করতে যাচ্ছি এখন, রানা। তবে কেব্‌ল ছাড়া অবশ্য।'

ভেতরটা আলো হয়ে উঠছে দেখে পিছনদিকে তাকাল রানা, ফিউজিলাজের শেষ মাথার বড় একটা অংশ ধীরে ধীরে দেহ থেকে আলগা হয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। ওটা র‍্যাম্প। ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পেল ও।

'ওটা পুরো খুলতে দু'মিনিট লাগবে, রানা,' আবার বলে উঠল সে। 'তারপর তোমার জন্যে চমৎকার এক স্কি-পোপ তৈরি হবে। অপেক্ষা করো।'

ভেতরে গরম একটু একটু বাড়ছে টের পেল রানা। হাইড্রলিকের গুঞ্জন বেড়ে গেছে অনেক। ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রবলবেগে পাক খাচ্ছে বাতাস। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে ওর। মরতে যদি হয়ই, গুলি খেয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বরণ করবে, ভাবছে ও। হ্যাচওয়ে দিয়ে লাফিয়ে নয়। দু'জনের মাঝখানের ব্যবধান বিশ ফুট হবে অনুমানে বুঝল। দূরত্বটা বেশিই।

স্টারলিফটার এখনও নামছে। ওটার নিম্নগতি রানার কাজে লাগতে পারত, যদি পিটার নিরস্ত্র হত, দুই লাফে ওর কাছে পৌঁছে যাওয়া কোন সমস্যা হত না। কিন্তু এখন তা হওয়ার নয়। বেশিরভাগ মানুষেরই অন্তরের গভীরে উচ্চতা সম্পর্কে কিছু না কিছু ভয় থাকেই। রানারও আছে। তাই এত উঁচু থেকে পড়ে মরার কোন ইচ্ছে নেই। মৃত্যুকে পরোয়া করে না ও, এ পেশায় ওটা যে-কোন সময় ঘটতেই পারে। কিন্তু সে-মৃত্যু হানা দেয় মুহূর্তে, প্রাণ কেড়েও নেয় পলকে। তার সাথে এর তফাত আছে।

পিছনের ফাঁক খুব দ্রুত বড় হচ্ছে এখন। বাইরে ধোঁয়ার মত মেঘ ভাসছে, পরিষ্কার দেখা যায় না কিছু। কপালে ভয়ের চিকন ঘাম ফুটছে টের পেল ও। একটু পর খুব ভারী এক ধাতব আওয়াজের সাথে লক হলো র‍্যাম্প, পুরো খুলে গেছে। ফাঁক গলে আস্ত একটা বাড়ি ঢুকে যাবে এখন অনায়াসে।

সেদিকে ইঙ্গিত করল পিটার কোল্ট নাচিয়ে। 'গো ডুন টায় হেল্, রানা।' হাসছে দাঁত বের করে।

'তোমার হারামীর বাচ্চা লেয়ার্ডকে নিয়ে তুমি যাও,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'বাইরে কি ঘটছে বুঝতে পারছ কিছু? ওরা তোমাদের জামাই আদর করতে এসেছে, বুঝলে?' কথার ফাঁকে দ্রুত একটা কিছু করার চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়।

পিছনে আকাশ কাত হলো আবার, হঠাৎ ডানে ঘুরতে শুরু করেছে স্টারলিফটার। রেইল ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল রানা, ঠিক করে ফেলেছে ঝাঁপ দেবে পিটারকে লক্ষ্য করে, যা থাকে কপালে। মরতে যদি হয়ই, গুলি খেয়ে মরবে, চেষ্টা করবে ওটাকেও সঙ্গে নিয়ে মরতে। স্টারলিফটারের নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ভয়াবহ এক ঝাঁকি খেলো।

এত জোর ঝাঁকির জন্যে তৈরি ছিল না রানা, রেইল থেকে ছুটে গেল হাত, ছুটে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেলো দড়াম করে। পিটারের দিকে চোখ রেখে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। জায়গা থেকে নড়েনি লোকটা, নড়ার জায়গাও নেই। এক হাতে সুইচটা ধরে পিছনের পার্টিশনের সাথে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর দুর্দশা দেখে আবার হাসল সে। কোল্ট দোলাল। 'যাও, রানা। লাফ দাও। ওড়া প্র্যাকটিস করোগে ডানা ছাড়া।' হাসি পূর্ণ বিস্তৃতি পেল দানবের, অস্ত্র তুলল রানার বুক সই করে। 'মুভ!'

জমে গেছে মাসুদ রানা। বুঝতে পারছে সময় শেষ, যা হোক এই মুহূর্তেই করতে হবে ওকে। এমন সময় পিটারের পিছনের পাইডিঙ দরজা সামান্য ফাঁক হলো। প্লেনের লাফঝাঁপের জন্যে ব্যাপারটা ঘটছে ভেবে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল রানা, তখনই দেখতে পেল রোজালিনকে। হাতে লম্বা ফলার এক ছোরা।

জিনিসটা দেখামাত্র চিনল ও–কপালে গুলি খাওয়া টেকনিশিয়ান মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর ওটা তার মোজার মধ্যে গোঁজা দেখেছে ও। ট্রাউজার উঠে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছিল। হাত তুলল রোজালিন, কোপ মারতে যাচ্ছে।

এভাবে ওদিকে তাকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না বুঝে পিটারের দিকে নজর ঘোরাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, কিছু একটা সন্দেহ হতে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল পিটার। দুই হাত পিছনেই দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখামাত্র রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কোল্ট ঘোরাতে শুরু করল। আঁতকে উঠে দ্রুত কয়েক পা এগোল রানা। পিটার গুলি করতে যাচ্ছে রোজালিনকে, ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও বেমক্কা আচরণ করল স্টারলিফটার। হঠাৎ করেই সোজা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পিছনমুখী থেকে অভ্যস্ত পিটার ঘুরে দাঁড়াতেই এই পরিবর্তন সামলে উঠতে পারল না, পড়ে যাচ্ছে ভেবে দ্রুত এক হাত বাড়াল ওপরের রেইল ধরবে বলে। প্রায় একই সঙ্গে ঝিকিয়ে উঠল রোজালিনের ছোরা, রেইল দেখার জন্যে অজান্তেই পলকের জন্যে মুখ তুলেছিল দানব, এই সুযোগে সর্বশক্তিতে ছোরা চালাল সে তার উন্মুক্ত গলায়। লম্বা ফলার প্রায় সবটুকু গেঁথে দিল ঘ্যাঁচ্ করে।

ঘূর্ণি বাতাসের গোঙানি আর এঞ্জিনের বিকট গর্জন ছাপিয়ে উঠল লোকটার গরগরা করার মত বিচিত্র, গোঁ-গোঁ আওয়াজ। কোল্ট ফেলে ছোরার বাঁট মুঠো করে ধরল সে, উইন্ডপাইপ কাটা পড়ায় দম নিতে পারছে না বলে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে দু'চোখ। হাঁ করে দম নেয়ার বৃথা কসরৎ করার ফাঁকে টান মেরে ছোরা বের করে ফেলল, অমনি ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল শার্ট।

গলা চেপে ধরে পাক্ খেয়ে পড়ে গেল দানব, গুঁড়ির মত গড়াতে শুরু করল হোল্ডের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত। ক্ষত থেকে দমকে দমকে রক্ত বেরিয়ে এসে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে ফ্লোরে। ওদিকে এঞ্জিনের আওয়াজ আবার বদলে গেছে, চড়া, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। নাক উঁচু করে হারানো অলটিচ্যুড ফিরে পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করছে স্টারলিফটার, উঠছে একটু একটু করে। তার সাথে তাল মিলিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে র‍্যাম্পের দিকে এগোতে শুরু করেছে নিয়ন্ত্রণহীন দানব, পথে রেখে যাচ্ছে রক্তের মোটা ধারা।

এক হাতে কলার ধরে লোকটার পতন ঠেকাতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না, ভীষণ ভারী দেহটা পিছলে ছুটে গেল। আরও কয়েক গড়ান দিয়ে লেজের কাছে ডেক যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেখানে গিয়ে থামল, তারপর আরেক গড়ান দিয়ে র‍্যাম্পে নেমে গেল। পতন শুরু হওয়ার আগমুহূর্তে ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করল যেন। তখনও একই রকম বিচিত্র গর-গর আওয়াজ করে গোঙাচ্ছে লোকটা।

শেষ মাথায় পৌঁছে অনেক কষ্টে উপুড় হলো পিটার, থাবা দিয়ে র‍্যাম্প ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করল নিজেকে। লাভ হলো না, সর সর করে ছেঁচড়ে নেমে যাচ্ছে ভারী দেহ, বাইরের এলোমেলো বাতাসে চুল উড়ছে তার প্রবল বেগে। একদম শেষ মুহূর্তে চোখ তুলল সে মেঝেতে খামচি মারতে মারতে, এক সেকেন্ডের জন্যে রানার চোখের ওপর আটকে থাকল ঘোলাটে হয়ে আসা দৃষ্টি। সে চোখে তীব্র ঘৃণা

আর হতাশা দেখতে পেল ও। পরমুহূর্তে হাত দু'দিকে বাড়িয়ে পাখির মত ভেসে পড়ল পিটার। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

তার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল রোজালিন। চেহারা ফ্যাকাসে। কোনমতে বলল, 'আমি···আমি ওকে খুন করেছি।'

'না,' কাঁধ ধরে মেয়েটিকে নিজের দিকে টেনে আনল রানা। 'আসলে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কাজটা তুমি না করলে এখন ওর জায়গায় আমাকে ভাসতে হত আকাশে।' নাইফ সুইচটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল ও, আবার শুরু হলো গুঞ্জন–উঠে আসতে শুরু করেছে র‍্যাম্প। কাজ সেরে কেবিনে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে থেমে পড়ল রানা পিছনের ফাঁক দিয়ে একজোড়া ডাসাল্ট সুপার মিরেজের ওপর চোখ পড়তে। দু'দিক থেকে তীরের মাথার মত মিলিত হওয়ার ভঙ্গিতে ছুটে আসছে বিদ্যুৎগতিতে, সোজা স্টারলিফটারের দিকে।

এসে পড়ল চোখের পলকে। দুটোরই নাকের কাছে উজ্জ্বল আলোর ঝলক দেখা গেল, পরক্ষণে বাতাসে কানের তালা ফাটানো বিকট আওয়াজ তুলে হারিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। প্রায় একইসঙ্গে পর পর কয়েকটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেলো আকাশ-দানব। ফিউজিলাজ ছেঁড়ার, বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। পায়ের নিচে ডেক টানা, দীর্ঘ ঢেউয়ের মত নাচতে শুরু করল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো শূন্যে থেমে পড়েছে বুঝি প্লেন, ঝুলে রয়েছে।

নাকে আগুনের গন্ধ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পাইভিঙ হ্যাচ খুলে ফেলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে নাকেমুখে ধাক্কা মারল ধোঁয়া। ওর মধ্যেও ছাদে কয়েকটা ফুটো দেখতে পেল দু'জনেই–স্মল ক্যালিবার শেলের কীর্তি। একটা এসে সোজা ঢুকে পড়েছে সাইমুরের কনসোলের মাঝখানে, আগুন ধরে গেছে ওটায়। উদ্বাহু নৃত্য করছে। প্রচণ্ড ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা ভেতরে।

চেঁচিয়ে মেয়েটিকে পিছিয়ে যেতে বলল রানা। মনে পড়েছে, কেবিনের ভেতরে দুটো বড় ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখেছিল ও। পিছনের হ্যাচওয়ের কাছেই দুদিকে দুই র‍্যাকে রাখা আছে। তার একটা টেনে নামাল, খুব ভারী সিলিন্ডার। ডেস্কের কোণায় বাড়ি মেরে তার অ্যাকটিভেটিং প্লাঞ্জার ভেঙে ফেলল রানা, সশব্দে বের হতে থাকা ফোম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি আগুন নেভাবার কাজে লেগে পড়ল। দুই এক্সটিংগুইশার পুরো শেষ করার পর নিভল আগুন। ধোঁয়া বের হওয়ার পথ করার জন্যে হ্যাচওয়ে খুলে ধরে থাকল ও কিছুক্ষণ।

এর মধ্যেও টের পেয়েছে, স্টারলিফটার এখন সোজা চলছে, স্বাভাবিক গতিতে। স্বাভাবিক ফ্লাইং প্যাটার্ন অনুসরণ করছে। একটু পর আবার মেঝে কেঁপে উঠল ওটার, বিকট শব্দ উঠল নিচে। ল্যান্ডিঙ গিয়ার নামাচ্ছে, টের পেল ও। আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক সংকেত ওটা–মিরেজগুলোকে বোঝাতে চাইছে আর শেল ছোঁড়ার প্রয়োজন নেই। ভাল হয়ে গেছি।

আরও কিছু সময় পর ভেতরে ঢুকল ওরা। ধোঁয়া খুব সামান্যই আছে তখন, পোড়া গন্ধও কম। সামনে তাকিয়ে সাইমুরকে দেখতে পেল না রানা। তার পড়ে থাকার জায়গাটা খালি। অন্য দু'জন যে যার জায়গাতেই আছে। গেল কোথায় ব্যাটা?

'রানা!' পোর্ট সাইডের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল রোজালিন। 'দেখে যাও, এদিকে দুটো ফাইটার দেখা যাচ্ছে। আমাদের সাথে সাথে এগোচ্ছে।'

কি ভেবে স্টারসাইডের জানালা দিয়ে উঁকি দিল ও। যা ভেবেছিল, এদিকেও আছে দুটো ডাসাল্ট সুপার মিরেজ। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল রানার, ওরা নামছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে পাক খাচ্ছে স্টারলিফটার, বেশ দ্রুত উঠে আসছে উপকূলরেখা। নিচে ল্যান্ডমার্ক দেখা দিতে ঘুরল ও, প্রথম টেকনিশিয়ানের হোলস্টার থেকে তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বের করে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল রোজালিনকে অপেক্ষা করতে বলে।

'কোথায় যাচ্ছ?' বলল মেয়েটি।

'তোমার চাচাকে ধরতে। আসছি এখনই।'

কিন্তু ধরা তো দূরের কথা, লোকটার দেখাই পাওয়া গেল না সারা প্লেন তন্নতন্ন করে খুঁজেও। নেই তো নেইই। অথচ পাইলট লোকটা দিব্যি করে বলছে, একটু আগেই ককপিটে গিয়েছিল সে। সন্দেহ হতে তাকে তার লকার চেক করতে বলল রানা, দেখা গেল ঠিকই ধরেছিল ও। এক সেট প্যারাশুট নেই ওখানে। পালিয়ে গেছে উন্মাদ বিজ্ঞানী।

একটু পর পারপিগনান এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল স্টারলিফটার ও চার মিরেজ। আর্মি বোঝাই তিন ট্রুপ ক্যারিয়ার আর দুই জীপ সাদা পোশাকের পুলিস, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ছুটে এল। প্রথম দল নিচে থাকল, অন্যরা উঠে এল ভেতরে। সরগরম হয়ে উঠল স্টারলিফটার। গ্রেফতার করা হলো ক্রুসহ অন্যদের।

একটুপর ব্রীফিঙের সময় এক মিরেজ পাইলট জানাল, সে সম্ভবত একজনকে বেল আউট করতে দেখেছে। শিওর নয় সে, প্রচুর ধোঁয়া বের হচ্ছিল তখন স্টারলিফটারের পিছন দিয়ে। আরেকজন দেখেছে অন্য একজনকে পড়ে যেতে। প্যারাশুট ছিল না তার।

'সাইমুর যদি সত্যিই সাগরে বেল আউট করে থাকে,' মন্তব্য করল এক ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস অফিসার। 'তাহলে তার উদ্ধার পাওয়ার কোন চান্স নেই। নির্ঘাত মরেছে।'

কিন্তু রোজালিনের ধারণা অন্যরকম। তার লাশ নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সে যে মরেছে, মানতে রাজি নয় মেয়েটি।

চোদ্দ

বিকেল চারটা। বিএসএস, লন্ডন। মারভিন লংফেলো ও রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা।

এতক্ষণ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছিল ও মুখে মুখে, লংফেলোর পি.এস নোট করে নিয়েছে শর্টহ্যান্ডে। নিয়ম অনুযায়ী টাইপ করে কম্পিউটরের রেকর্ড ব্যাঙ্কে

তুলে রাখা হবে পরে।

ফ্রান্স থেকে ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের বিশেষ প্লেনে চড়ে একটু আগে ফিরেছে রানা ও রোজালিন। এখানে আসার পথে মেয়েটিকে হিলটন হোটেলে তুলে দিয়ে এসেছে ও, কথা দিয়ে এসেছে কাজ সেরেই ফিরে আসবে। রানার বহাল তবিয়তে ফিরে আসায় দুই বৃদ্ধই যে মোটামুটি খুশি, তা বেশ পরিষ্কার। তবু, সাইমুরের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভুলতে পারছেন না কেউ। পারছে না রানা নিজেও। বারবার একই কথা ভাবছে, শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

এক সময় মনের খেদ প্রকাশ করেই বসলেন রাহাত খান। পাইপে তামাক ভরার ফাঁকে বললেন, 'তবু, লোকটার পালিয়ে যাওয়াটা···' থেমে গেলেন কথা শেষ না করে। রানার মনে হলো বুড়ো হয়তো 'ঠিক হয়নি, বা ধরা দেয়া উচিত ছিল তার' ধরনের কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন।

'বুঝি, স্যার,' রানা বলল। 'কিন্তু···' টেলিফোনের শব্দে থেমে পড়ল। লাল ফোনটা বাজছে।

রিসিভার তুললেন লংফেলো, 'ইয়েস?' বলে নীরবে ওপ্রান্তের কথা শুনতে লাগলেন। ঝাড়া পাঁচ মিনিট শুনে গেলেন। থেকে থেকে এমনভাবে রানার দিকে কয়েকবার তাকালেন, ওর নিশ্চিত ধারণা জন্মাল বিষয়টা ওর অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কিতই হবে। ভুল হয়নি রানার। ঠিকই ধরেছিল। রিসিভার রেখে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, রাহাত খানকে একপলক দেখে নিয়ে ওর দিকে ফিরলেন। 'সাইমুর মরেনি, রানা। বেঁচে আছে।'

পাইপ টানা বন্ধ হয়ে গেল মেজর জেনারেলের, কুঁচকে উঠল কাঁচাপাকা ভুরু। রানা সোজা হয়ে বসল। 'সাগর থেকে তাহলে উদ্ধার করা হয়েছে লোকটাকে?'

'ও সাগরে পড়েইনি, রানা।'

'কিন্তু তাহলে···'

'প্যারাশুটে বোঁচকা বেঁধে ফেলে দিয়েছিল হয়তো। ব্যাটা আসলে স্টারলিফটারেই ছিল, ফাঁকিটা কেউ ধরতে পারোনি তোমরা।'

'মানে?'

'ফোন করেছিল আমাদের পারপিগনান এজেন্ট। ও বলল ফ্রেঞ্চ অথরিটি প্লেন তল্লাশী করতে গিয়ে এক কনসোল ডেস্কের নিচে গোপন একটা কুঠুরি খুঁজে পেয়েছে। একজনের লুকিয়ে থাকার জন্যে যথেষ্ট ওটা। তলা দিয়ে বের হওয়ার পথ আছে কুঠুরির, খুঁজতে গিয়ে ওটা খোলা পেয়েছে তারা।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল রানা। 'সাইমুর ক্যাসেলের কি অবস্থা, স্যার?'

'মানে?' প্রশ্ন করলেন লংফেলো।

'ওপেন আছে, না গার্ড দেয়ার-ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'না, ওপেন আছে। কাল একবার ভেবেছিলাম অবশ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ পাঠাব, পরে আর পাঠাইনি। কেন?'

'আমি যাব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'আজ রাতেই।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্নটা করলেন এবার রাহাত খান।

'স্যার, এতবড় একটা কাণ্ড যে ওই লোকই ঘটিয়েছে, আমরা জানি, কিন্তু তা কোর্টে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। কোথাও কোন প্রমাণ রাখেনি সাইমুর। সে-সব আছে ক্যাসেলে। লোকটার স্টাডিতে, টর্চার চেম্বারে, আর আমার রেকর্ড করা মাইক্রো ক্যাসেটে, যে ক্যাসেটে আরগুয়েলোর সাথে তার আলাপের খানিকটা রেকর্ড করেছি আমি। সাইমুর তা ভালই জানে। কাজেই ওসব ধ্বংস করতে সে আসবেই, খুব সম্ভব গভীর রাতে। ওগুলো নষ্ট করে দিতে পারলে আবার বুক ফুলিয়ে বাইরে বের হবে লোকটা, একটা টোকাও কেউ দিতে পারবে না ওর গায়ে। আমি চাই প্রমাণগুলো উদ্ধার করে আনতে, সম্ভব হলে সাইমুরকেও ধরে নিয়ে আসব।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বললেন লংফেলো। 'কিন্তু···'

'যে ফ্লাইঙ ক্লাব থেকে সেদিন পারপিগনান গিয়েছিলাম, সেখানে অ্যালডান কোম্পানির আরও দুটো কপ্টার দেখেছি। আমার বিশ্বাস কপ্টার নিয়ে আজ রাতেই মারক্কান্ডি যাবে ও। আমার জন্যেও একটা কপ্টারের ব্যবস্থা করুন। ইনফ্রা-রেড ফিট করা একটা চিপমাঙ্ক হলে ভাল হয়। তা না হলে গ্যাযেল।'

'কিন্তু দুর্গে ঢুকবে কি করে? ওখানে যে বললে সব দরজায় ইলেকট্রনিক তালার কারবার!'

'একটা পথ আছে, স্যার। আমি চিনি। ওটায় সাধারণ তালা।'

খানিক মাথা ঘামালেন বৃদ্ধ। 'তাহলে তো ওভারফ্লাইটের ব্যবস্থাও করতে হয়। যদি সে আসেই, তোমার আগেই পৌঁছল কি না সেদিকে নজর রাখবে ওটা। ল্যান্ড করার আগে খবর জেনে নিতে পারবে তুমি।'

'সে তো আরও ভাল হয়।'

'আমার মতে রানার ধারণাই ঠিক,' বলে উঠলেন রাহাত খান। 'লোকটা আসবে প্রমাণ নষ্ট করতে। ওর যাওয়া উচিত।'

মাথা দুলিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন বিএসএফ চীফ।

ভোর চারটায় মারক্কান্ডি পৌঁছল মাসুদ রানাকে নিয়ে গ্যাযেল। সঙ্গে বিএসএসের এক অপারেটর আছে, ল্যারি ডুগান। একে জোর করে সাথে গছিয়ে দিয়েছেন লংফেলো ওর একা আসা উচিত হবে না বলে। আগেও এর সাথে দুয়েকটা কাজ করেছে রানা। এ কাজে একেই বাছাই করা হয়েছে এই জন্যে, যে ক্লীনারকে হিথ্রোয় খুন করেছিল আরগুয়েলো, সে ডুগানের ছোট ভাই। যেখানে স্যাব ডিচে পড়েছিল, তার কাছে ল্যান্ড করল কপ্টার। জায়গাটা ঢালু, ক্যাসেল থেকে দেখা যায় না। অবশ্য দেখার মত কেউ ওখানে আছে বলেও মনে হয় না রানার। তবু, সতর্ক থাকল।

ল্যান্ড করার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ওভারফ্লাইটের সাথে কথা বলেছে গ্যাযেলের পাইলট। ওটা ছিল একটা চিপমাঙ্ক। 'অল ক্লিয়ার' জানিয়েছে ওটা গ্যাযেলকে। মাঝ রাত থেকে ক্যাসেলের ওপর লটকে আছে ওটা, এরমধ্যে কোন গাড়ি বা কপ্টার ক্যাসেলের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি। তল্পিতল্পা নিয়ে নিশ্চিন্তে ক্যাসেলের দিকে হাঁটা ধরল রানা ও ডুগান। ভোরের বাতাস পরিষ্কার, ঠাণ্ডা।

আড়াআড়ি চলেছে ওরা গ্রাম এড়িয়ে, মাঝেমধ্যে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে পথ।

পুরো আধঘণ্টা লাগল ওদের দুর্গের কাছে পৌঁছতে। হুকওয়ালা দড়ির লাইনের সাহায্যে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়তে কোন সমস্যা হলো না। সামনের বিশাল লনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ওরা ভাল করে। গায়ের মধ্যে ছমছম করে উঠল রানার দুর্গের প্রকাণ্ড, অন্ধকার কাঠামোটা দেখে। কোথাও প্রাণের বিন্দুমাত্র সাড়া নেই। ভেতরের হলরুম, ড্রইংরুম, ইস্ট গেস্ট রুম, স্টাডি, টর্চার চেম্বার, সব এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার।

ট্রেডমেনস এন্ট্রান্সটা খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। এই দরজা চেনে রানা, কারণ এ পথেই সেদিন ওকে বের করে এনেছিল পিটার, ভ্যানে তুলেছিল। সঙ্গে আনা বড় এক গোছা চাবি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। নিতান্তই সাধারণ তালা, তার ওপর বহু ব্যবহারে নড়বড়ে অবস্থা, মাত্র দু'মিনিটের চেষ্টাতেই খুলে গেল। চাবিটা রিঙ থেকে খুলে ফেলল ও। ভেতরে ঢুকে পড়ল। মাত্র কয়েকদিন হলো লোকজন নেই বাড়িতে, অথচ এরইমধ্যে ভেতরের বাতাসে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ চেপে বসেছে।

এগোতে শুরু করল রানা ও ডুগান। কথা আছে প্রথমে অপারেশন মেল্টডাউনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখবে ওরা। পেয়ে গেলে ভাল, না পেলে রজার সাইমুরের পৌঁছার আশায় ঘাপটি মেরে থাকবে। এলে তার ঘাড় ধরে আদায় করবে সে সব। বাইরে এতক্ষণে নিশ্চই আলো ফুটতে শুরু করেছে, ভাবল রানা। লোকটা কি আসবে? যদি আসে, হয় এখনই আসবে, নয়তো কাল রাতে। দিনে আসার প্রশ্নই আসে না।

হাঁটার মধ্যে হঠাৎ ওর বাহু চেপে ধরল ল্যারি ডুগান্। কথা বলতে নিষেধ করল আঙুল তুলে। 'একটা শব্দ!' বলল ফিসফিস করে।

কান পাতল রানা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কোথায় কি! লোকটা ভুল শুনেছে ভেবে এগোবার জন্যে পা তুলেছিল ও, থেমে পড়ল চট্ করে। হ্যাঁ, আওয়াজ আসছে একটা, অনেক দূর থেকে, ভোমরার গুঞ্জনের মত।

'সাইমুর!' বলে উঠল ও। 'হারামজাদা এসেছে তাহলে!' ভেবে দেখল, তার আসাটা অসময়ে হয়ে গেছে। এতক্ষণে আলো নিশ্চই ফুটেছে, চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে লোকটার। কাজেই বেশিক্ষণ থাকবে না, প্রমাণপত্র যা যা নেয়ার, নিয়ে এখনই আবার ভোগে যাবে।

ভালই হলো। ওদের আর কষ্ট করে কোথায় কি আছে খোঁজার দরকার হবে না। সে-ই এসে সব এক জায়গায় করুক, তারপর রয়ে-সয়ে ধরা যাবে ব্যাটাকে।

'হলের দিকে চলো,' বলে হাঁটা ধরল ও। ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে গুঞ্জন। হলরুমের এক অন্ধকার কোণে এসে দাঁড়াল দু'জনে, আওয়াজ শুনছে কান পেতে। একটু পর মনে হলো নেমেছে কপ্টার। মন দিয়ে ওটার রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনতে লাগল রানা। যদি পাইলট এঞ্জিন অফ না করে, তাহলে বোঝা যাবে ওর অনুমানই ঠিক, এখনই পালাবে। আর যদি উল্টোটা হয়…

চাপা একটা ক্লিক শব্দ উঠল, ওরা যেটা দিয়ে ঢুকেছে, সেই দরজার তালা খোলার। ভেতরে ঢুকছে সাইমুর। বন্ধ হলো না আর তালা, দরজা ভিড়িয়ে রেখেই এগিয়ে আসতে শুরু করল সে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও বেশ দ্রুত পায়ে হাঁটছে। স্বাভাবিক। এটা তারই বাড়ি, সে জানে কোন পথ দিয়ে কোনদিকে যেতে হয়। ছোট ছোট, দ্রুত পদক্ষেপের আওয়াজ শুনল রানা মন দিয়ে। ওদিকে তখনও অফ হয়নি কন্টারের এঞ্জিন।

স্টাডির দিকে চলে গেল সাইমুর ওদের কয়েক হাত সামনে দিয়ে। ডুগানের কাঁধে টোকা দিয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা। নিঃশব্দে পা চালিয়ে বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল অস্ত্র বাগিয়ে। কন্টারের আওয়াজ একদম কাছেই শুনতে পাচ্ছে ওরা, কিন্তু কয়েকটা গাছের জন্যে দেখা যাচ্ছে না ওটাকে।

বড়জোর সাত কি আট মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তাতেই মনে হলো যেন কয়েক যুগ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা এক জায়গায়। ভেতর থেকে পাথরের মেঝেতে খুব দ্রুত ছুটে আসার আওয়াজ উঠল হঠাৎ করে। আসছে বিজ্ঞানী। একটু পর দড়াম করে খুলে গেল দরজা, বেরিয়েই দৌড় শুরু করল লোকটা। বাঁ হাতে একটা ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে তার, অন্য হাতে লম্বাটে কি যেন একটা, বোঝা গেল না।

মৃত টেকনিশিয়ানের পিস্তলটা তুলল মাসুদ রানা, ডুগানও তুলল নিজেরটা। ওদের ছাড়িয়ে আট-দশ পা এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানী, এই সময় পিছন থেকে হাঁক ছাড়ল রানা, 'থামো, সাইমুর! তোমার খেলা শেষ।'

থামল না লোকটা, কেবল গতি সামান্য কমাল, ওরইমধ্যে ডান হাতে ধরা লম্বাটে জিনিসটাকে ওপরে তুলল সে। রানার গলার স্বর লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিল। গুলি ফুটল, পরক্ষণে একটা তীব্র হিশ্‌শ আওয়াজের সাথে উলকার মত পিছনে আগুনের লেজ রেখে কি যেন একটা ছুটে এসে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল রানা ও ডুগানের মাঝের দরজার ওপর। দেয়াল কেঁপে উঠল দুর্গের, দরজাসহ পাথরের দেয়ালের বেশ বড় একটা অংশ চুরমার হয়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

মুহূর্তে রানা বুঝে ফেলল জিনিসটা কি। ওটা এম.বি.এ. জাইরোজেট রকেট পিস্তল–হ্যান্ড লঞ্চার। জিনিসটা সেদিন দেখেছে রানা বিজ্ঞানীর মাটির নিচের অফিসের দেয়ালে। এক সাথে পাঁচটা খুদে রকেট ছুঁড়তে পারে ওটা। আরেকবার হাঁক দেবে কি না ভাবল ও, পরক্ষণে সে চিন্তা বাতিল করে পিস্তল তুলল। ওর দেখাদেখি ডুগানও, লোকটা ততক্ষণে বেশ এগিয়ে গেছে। আর কয়েক পা যেতে পারলেই গাছের আড়ালে চলে যাবে।

গুলি করল রানা। ওর এবং ডুগানের গুলি এক মুহূর্তেরও অল্প সময়ের ব্যবধানে আঘাত করল সাইমুরকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, পরক্ষণে উঠে পড়ল হাঁচড়েপাঁচড়ে। ফোল্ডারটা বুকের সাথে চেপে ধরে এলোমেলো পায়ে ছোটার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, দু'তিন পা গিয়েই বসে পড়ল। আস্তে করে শুয়ে পড়ল কাত হয়ে।

দৌড় দিল রানা। ওকে দেখে দুর্বোধ্য গলায় কি যেন বলতে বলতে আবার

উঠে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল সাইমুর, তারপর আচমকা শিথিল দেহে এলিয়ে পড়ল। হাত থেকে ছুটে গেছে ফোল্ডার, রক্তে একাকার। ওটা সরিয়ে রেখে লোকটার ক্ষত দুটো পরীক্ষা করল রানা, এক মুহূর্ত পর চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল। গুলি একটা লেগেছে ঘাড়ে, অন্যটা ডান পিঠ দিয়ে ঢুকে খুব সম্ভব লাংস ফুটো করে ঢুকে গেছে। ঠোঁটের কোনায় রক্তের বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে তার।

অল্প সময়ের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল বোধহয় বিজ্ঞানী, হঠাৎ এক ঝাঁকি খেয়ে চোখ মেলল। হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজল যেন মাটিতে। পরক্ষণে খোলা, মৃত্যুর পরশ লাগা চোখের ভেতরের সুপ্ত লাভা একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

চুপ করে কিছুক্ষণ মৃত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে তাকাল।

ভোরের প্রথম আলোর স্পর্শে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে বিশাল কাঠামোটা। তিনশো বছরের পুরানো দুর্গ-সাইমুর ক্যাসেল। অভিজাত লেয়ার্ড অভ মারকান্ডির ক্যাসেল।

* * *